আকিদাতুল মুসলিম

عقيدة

সংকলন
জর্দান ফতোয়া বোর্ড

অনুবাদ
মুহাম্মদ তানজীম আহমদ

ইতকান একাডেমি

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আকিদাতুল মুসলিম

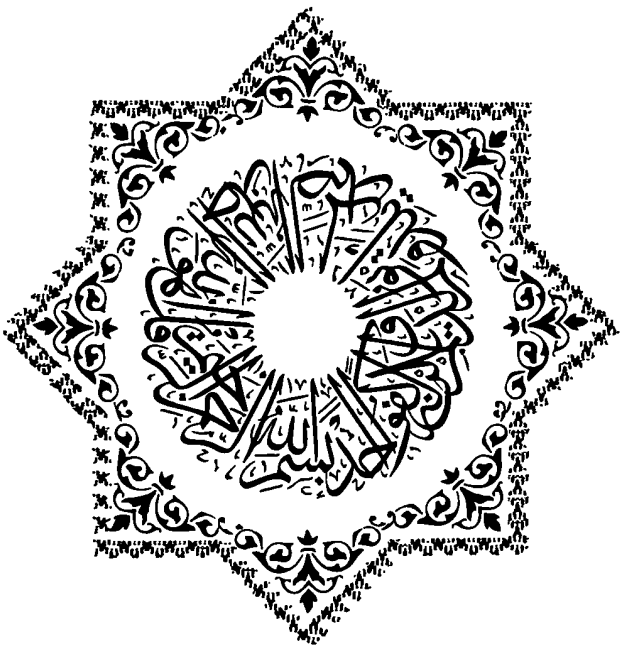

আকিদাতুল মুসলিম

সংকলন
জর্দান ফতোয়া বোর্ড

অনুবাদ
মুহাম্মদ তানজীম আহমদ
শিক্ষক, লেখক ও অনুবাদক

প্রকাশক
ইতকান একাডেমি

বই : **আকিদাতুল মুসলিম**

সংকলনে : জর্দান ফতোয়া বোর্ড

অনুবাদক : মুহাম্মদ তানজীম আহমদ

প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৫

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : মৌচাক টিম
০১৬২৪৬১৪৭৯০

মুদ্রণ ও বাঁধাই : মৌচাক প্রিন্টার্স
০১৬২৪৬১৪৭৯০

প্রকাশক : ইলমকান একাডেমি
দারুননাজাত, পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৩০৫৩৩০৭১৭

পরিবেশক : **মাকতাবাতুন নাহদাহ**
দারুননাজাত, পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৩০৫৩৩০৭১৭

মূল্য : ২৪০ টাকা মাত্র

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

বাতিলের দম্ভিত হুঙ্কারে যিনি গর্জে উঠেছিলেন নির্ভীক কণ্ঠে,
সত্যের দীপ্ত ভাষ্যকার, আহলে সুন্নাতের অমর প্রহরী-
যাঁর কলম ছিল বিদ্যুৎপ্রতাপ, চিন্তায় ছিল উম্মাহর জাগরণ,
ত্যাগ ছিল নিরবধি, নিরবতা ছিল এক সাহসী উচ্চারণ।

শতাব্দীর আবর্তে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন সময়ের মুখোমুখি,
মুজাদ্দিদরূপে যাঁর আত্মপ্রকাশ ছিল আলোর দিশারি,
প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় যিনি হয়েছিলেন যুগ চিন্তার মুকুটধারী-
শাইখুল ইসলাম ইমাম আল্লামা যাহিদ আল-কাওসারী (রহ.)।

এ মহান মনীষীর মাকাম বুলন্দির তরে এ ক্ষুদ্র নাযরানা।

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

আকিদা-মানবজীবনের আলোকবর্তিকা, চিন্তা ও কর্মের দিকনির্দেশক এবং আখিরাতে মুক্তির মূল পাথেয়। এটি কেবল বিশ্বাস নয়, বরং অন্তরের বিশুদ্ধতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও আত্মার নিরাপত্তার ভিত্তি। আল্লাহ প্রদত্ত বিবেচনাশক্তি যখন বিশুদ্ধ ঈমান ও ইসলামী নৈতিকতার আলোকে পরিচালিত হয়, তখনই তা মানুষকে সফলতায় পৌঁছে দেয়। ইতিহাস প্রমাণ করে, বিশুদ্ধ আকিদাই জাতিকে দিয়েছে মর্যাদা, আর বিকৃত আকিদা তাদের করেছে বিভ্রান্ত ও দুর্বল।

এই মহান বাস্তবতার প্রতিফলন সরূপ নবুয়তের সূচনালগ্নেই মক্কার তেরো বছর ছিল এক দীর্ঘ আকিদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- যেখানে কুরআনের ধারাবাহিক অবতরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল ঈমানের বুনিয়াদ। এরপর মদীনায় এসে ধীরে ধীরে শারঈ বিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিপূর্ণতা লাভ করে। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং পরবর্তী ইমাম ও আলিমগণও যুগের চাহিদা অনুযায়ী আকিদা সংশোধন, বাতিল মতাদর্শের খণ্ডন ও বিশুদ্ধ আকিদা প্রচারে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন।

এই ধারাবাহিকতায় জর্দানের دائرة الإفتاء العام -এর উদ্যোগে সংকলিত হয় সংক্ষিপ্ত আকিদা সংকলন "আকিদাতুল মুসলিম"। কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত সুবিন্যস্ত এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামী আকিদার প্রায় সকল মৌলিক বিষয়কে একত্র করেছে। শুরুতেই রয়েছে আকিদার বিকাশ, ঈমানের বহুমাত্রিক তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা। এরপর আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, সিফাত ও গুণাবলি নিয়ে যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা, কুরআন-সুন্নাহর মুতাশাবিহ বিষয়সমূহ বুঝার পদ্ধতি, এবং নবুয়্যাত, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদীর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়গুলোর ধারাবাহিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিতাবের শেষে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা, আহলুস সুন্নাহর আকিদাগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আকিদা শিক্ষার জন্য প্রস্তাবিত পাঠক্রমও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সমসাময়িক ধর্মীয় সংশয় ও বিকৃত চিন্তার যে জোয়ার লক্ষ করা যায়, তার প্রেক্ষাপটে কিতাবটির প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। অল্প পরিসরে আকিদার এমন বিস্তৃত কাঠামো, এবং বিভ্রান্তি নিরসনে সংগঠিত ও সংক্ষিপ্ত জবাব সংকলিত থাকায় সাধারণ মুসলিম, ছাত্র ও পাঠকের জন্য এটি হয়ে উঠেছে এক অনন্য আকিদা-সহায়ক গ্রন্থ।

২০২১ সালে আমরা এর অনুবাদ কাজ সম্পন্ন করি এবং প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনী সংযোজন করি, কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে সে সময়ে প্রকাশের সুযোগ হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ, আজ তা আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে- এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও প্রথম প্রেরণাদাতা-উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা আনিছুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ- এর প্রতি, যিনি শুরু থেকে সাহস ও দোয়ার উৎস ছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের সম্মানিত অধ্যক্ষ আবুল খায়ের মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক হাফিযাহুল্লাহ-এর প্রতিও, যিনি সদা পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন অনুপ্রেরণার বাতিঘর।

বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার প্রিয় উস্তায ও মুরব্বীদের-শাইখুল হাদীস মুফতি আব্দুল লতিফ শেখ, মাওলানা নজরুল ইসলাম এবং আল-আলেমুল মুহাক্কিক মাওলানা বদরুল আমিন হাফিযাহুমুল্লাহ-এর কথা-যাঁদের থেকে আকিদার মর্ম ও মৌলিকত্ব শিখেছি।

এছাড়াও যাঁরা এই অনুবাদ ও প্রকাশ-প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছেন-বিশেষ করে প্রিয় ভাই মাওলানা নাযিম উদ্দিন হাফিযাহুল্লাহ সহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও দোয়া জানাই।

আকিদা বিষয়ে লেখা কিংবা অনুবাদ একটি অতি দায়িত্বশীল কাজ। আমরা যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করেছি, তবে মানবীয় ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে যদি কোনো অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, তা আমাদের অবগত করলে আমরা কৃতজ্ঞ হব এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টা করব।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ তিনি যেন এ কিতাবকে উম্মতের জন্য উপকারী হিসেবে কবুল করেন এবং আখিরাতে আমাদের নাজাতের জরিয়া বানান। আমিন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

বিনীত
মুহাম্মদ তানজীম আহমদ
দারুননাজাত, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা
১১ মে, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভিকা	১৩
আকিদার আলোচনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি	১৪
এ শাস্ত্রে আমাদের প্রচেষ্ঠা নিবদ্ধ করার কারণ	১৫
আশয়ারী-মাতুরিদী ধারা তৈরির নেপথ্যে কারণ	১৫
আকিদা শাস্ত্রে দুই উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয়	১৭
উলামাগণ কেন নিজেদের আশয়ারী-মাতুরিদী হিসেবে পেশ করেন?	১৮
আশয়ারী-মাতুরিদী বিখ্যাত ইমামগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা	২০
আকিদার মাসয়ালাগুলোকে তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশ	২১
মুখবন্ধ	২২
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ঈমানের মর্মকথা	২২
মুকাল্লাফের পরিচয়	২২
আকিদায় তাকলিদ করার জটিলতা	২৪
আল্লাহর পরিচয় লাভই একজন বিবেকবানের সর্বপ্রথম দায়িত্ব	২৫
আল্লাহ ব্যতীত এ পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব	২৫
ঈমানের মর্মকথা	২৬
ঈমানের মৌলিকত্ব হলো তাসদীক তথা অন্তরে বিশ্বাস	৩৫
মুখে স্বীকৃতি ও কর্মের সাথে ঈমানের সম্পৃক্ততা	৩৭
ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের তাৎপর্য	৩৮
মাতুরিদীদের নিকট ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের ব্যাখ্যা	৩৯
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্কতা	৪০
প্রথম অধ্যায়: ইলাহিয়্যাত (আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কিত বিশ্বাস)	৪২
আল্লাহ তায়ালার শানে অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি	৪৩
আল্লাহর শানে অপ্রযোজ্য বিষয়াবলি	৪৪
আল্লাহ তায়ালার শানে আবশ্যিক গুণাবলির প্রকারভেদ	৪৪
প্রথম প্রকার: সিফাতুন নাফসিয়্যাহ (সত্তাগত গুণ)	৪৫
الوُجُود (অস্তিত্বতা)	৪৫
দ্বিতীয় প্রকার: সিফাতুস সালবিয়্যাহ (নাকচবোধক গুণাবলি)	৪৬
ক. "القِدمُ (আদিত্ব)"	৪৬
খ. "البَقَاء (অনন্ত)"	৪৬

গ. "القِيامُ بالنَّفْس (স্বনির্ভরতা)" ৪৬
ঘ. "مخالفته تعالى للمخلوقات (সৃষ্ট বস্তুর বৈপরিত্য)" ৪৭
ঙ. "الوَحْدانِيَّة (এককত্ব)" ৪৮
তৃতীয় প্রকার: সিফাতুল মা'আনী (অর্থজ্ঞাপক গুণাবলি) ৪৮
"الحَيَاة (হায়াত)" ৪৯
"العِلْم (জ্ঞান)" ৪৯
"الإرادة (ইচ্ছা)" ৫০
"القُدْرة (ক্ষমতা)" ৫১
"التَكْوِين (অস্তিত্ব দান)" ৫৩
"الكلام (কালাম বা কথা)" ৫৩
"السمْع (শ্রবণ)" ৫৩
"البَصَر (দৃষ্টি)" ৫৪
আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম ও গুণাবলি অসিম ৫৫
আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ৫৫
দ্ব্যর্থবোধক (المُتَشَابِهَات) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূলনীতি ৫৬
তা'বীল ও তাফউইদ আহলুস সুন্নাতের গৃহীত দুইটি পন্থা ৫৭
তাফউইদ (تفويض) এর পরিচয় ৫৭
তা'বীল (تأويل) এর পরিচয় ৫৮
বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত ইসবাত (الإثبات) পরিভাষার তাৎর্পয ৫৯
সাদৃশ্যবাদীদের ইসবাত ব্যবহারের উদ্দেশ্য ৫৯
أَمِرُّوهَا كَمَا جَائَتْ – এর তাৎপর্য ৬০
আল্লাহ তায়ালা মানুষের কর্মের স্রষ্টা ৬১
বান্দা তার কর্ম নির্বাচনে স্বাধীন এবং এর উপরই জিজ্ঞাসিত হবে ৬১
(قَضَاء) ও (قدر) এর তাৎপর্য ৬২
সমস্ত কিছু ফয়সালাকৃত বলে যুক্তি প্রদর্শনের হুকুম ৬৩
আনুগত্যশীলদের প্রতিদান এবং অবাধ্যচারীদের শাস্তির হুকুম ৬৪
(شَقِيٌّ) ও (سَعِيد) এর মর্মকথা ৬৮
আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভের প্রামাণিকতা ৬৯
কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ইস্তিওয়া (الاستواء) এর তাৎপর্য ৭১

আল্লাহর ক্ষেত্রে (أين বা কোথায়?) শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা..... ৭২
হাদিসুল জারিয়াহ নিয়ে ইমাম নববী রহ. এর চমকপ্রদ বিশ্লেষণ..... ৭৪
ইলাহিয়্যাত অধ্যায়ের পরিশিষ্ট..... ৭৬
দ্বিতীয় অধ্যায় (নবুওয়্যাত) ৭৭
নবী রাসূলের অর্থ ৭৮
নবী ও রাসূল প্রেরণের পটভূমি..... ৭৯
রাসূলগণের নাম জানার আবশ্যকতা..... ৮১
নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে আবশ্যিক আকিদা..... ৮২
নবী-রাসূলগণের আবশ্যকীয় গুণাবলি ৮৩
ইসমাতুল আম্বিয়া ৮৩
নবী-রাসূলদের শানে অপ্রযোজ্য বিষয় নাকচ করার আবশ্যকতা ৮৬
নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়াবলি..... ৮৭
হযরত আইয়ুব আ. কে ১৮ বছর কীড়ায় ধরার বর্ণনা অসত্য ৮৭
নবুয়্যাতপ্রাপ্তি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহকৃত, প্রচেষ্টায় প্রাপ্তির বিষয় নয়..... ৮৮
মুহাম্মদ ﷺ খাতামুল আম্বিয়া..... ৮৯
নবীদের মু'জিযা সত্য..... ৯০
নবীগণের প্রসিদ্ধ কিছু মু'জিযা ৯১
সাইয়্যিদুনা সালেহ عليه السلام এর মু'জিযা..... ৯১
সাইয়্যিদুনা মুসা عليه السلام এর মু'জিযা..... ৯২
সাইয়্যিদুনা ঈসা عليه السلام এর মু'জিযা..... ৯২
সাইয়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মু'যিজা ৯৩
তৃতীয় অধ্যায়: সামঈয়্যাত (কুরআন-সুন্নাহ স্বীকৃত অন্যান্য আকিদা) ৯৪
সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি..... ৯৪
ইসরা এবং মি'রাজ সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস ৯৫
আম্মাজান সাইয়্যিদাহ আয়েশার (রা.) পবিত্রতা..... ৯৬
আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যারা ৯৭
সাহাবীদের মর্যাদা..... ৯৮
সাহাবীদের মতপার্থক্যে একজন মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি..... ৯৮
প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে একজনের তাকলীদের বাধ্যবাধকতা ৯৯
ওলীর তাৎপর্য ও সৎকর্মশীল ওলীদের মর্যাদা..... ১০০
ওলীদের কারামত ১০১
ইসলামে দোয়ার গুরুত্ব এবং বান্দার জীবনে এর প্রভাব ১০৩
রুহের মর্মকথা..... ১০৪

কবরে দুই ফেরেশতার জিজ্ঞাসাবাদের উপর ঈমান আনার হুকুম..... ১০৫
কবরের আযাব ও নিয়ামত..... ১০৬
কিয়ামত দিবস ও পরবর্তী অদৃশ্য বিষয়গুলোতে ঈমান আনার আবশ্যকতা.. ১০৭
পুনরুত্থান..... ১০৮
হাশর..... ১০৮
হিসাব..... ১০৯
কিয়ামত দিবস..... ১০৯
আমলনামা গ্রহণ..... ১০৯
জান্নাত-জাহান্নাম..... ১০৯
হাওযে কাউছার ও শাফায়াত..... ১১০
তওবা ব্যতীত পাপে নিমগ্ন থাকার হুকুম..... ১১০
পরিশিষ্ট..... **১১১**
গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মাসয়ালার বর্ণনা ও বিশিষ্ট আলেমদের জীবনী..... ১১১
প্রথম: মুসলিমদের তাকফীর করার হুকুম..... ১১২
দ্বিতীয়: কাফেরকে তাকফীর না করার হুকুম..... ১১৩
তৃতীয়: আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জবাই করা..... ১১৪
চতুর্থ: কবরে তাওয়াফ করা..... ১১৬
পঞ্চম: আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন নামে হলফ করা..... ১১৮
ষষ্ঠ: উসিলা গ্রহণের হুকুম..... ১১৯
সপ্তম: বিদয়াতের অর্থ ও তার প্রকারভেদ..... ১২১
অষ্টম: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা মাযহাব..... ১২২
নবম: আশয়ারী-মাতুরিদীদের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম..... ১২৩
ইমাম আল-বাকিল্লানি (মৃত্যু: ৪০৩ হি:)..... ১২৪
ইমাম ইবনু ফুরাক (মৃত্যু: ৪০৬ হি:)..... ১২৫
ইমাম জুয়াইনি (মৃত্যু: ৪৭৮ হি:)..... ১২৫
ইমাম গাযালী (মৃত্যু: ৫০৫ হি:)..... ১২৫
ইমাম রাযী (মৃত্যু: ৬০৬ হি:)..... ১২৬
ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮ হি:)..... ১২৬
ইমাম কুশাইরী (মৃত্যু: ৪৬৫ হি:)..... ১২৬
ইমাম বাগাভী (মৃত্যু: ৫১০ হি:)..... ১২৭
ইমাম ইবনু আসাকির আদদিমাশকি (মৃত্যু: ৫৭১ হি:)..... ১২৭
ইমাম নববী (মৃত্যু: ৬৭৬ হি:)..... ১২৭
ইমাম বাইযাবী (মৃত্যু: ৬৮৫ হি:)..... ১২৮
ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হি:)..... ১২৮

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (মৃত্যুঃ ৮৫৫ হিঃ) ১২৮
ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (মৃত্যুঃ ৯১১ হিঃ) ১২৯
ইমাম ইয ইবনু আব্দিস সালাম (মৃত্যুঃ ৬৬০ হি.) ১২৯
ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী (মৃত্যুঃ ৭২৭ হিঃ) ১২৯
ইমাম কামাল ইবনুল হুমাম (মৃত্যুঃ ৮৬১ হিঃ) ১৩০
ইমাম যাকারিয়া আনসারী (মৃত্যুঃ ৯২৬ হিঃ) ১৩০
ইমাম ইবনে হাজর হাইতামী (মৃত্যুঃ ৯৭৩হিঃ) ১৩০
ইমাম হাকিম আস-সমরকান্দি রহ. (মৃত্যুঃ ৩৪২ হি.) ১৩১
ইমাম আবুল ইউসর মুহাম্মাদ বাযদাভী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯৩ হি.) ১৩১
ইমাম আবুল মুঈন আন-নাসাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৫০৮ হি.) ১৩২
ইমাম আবু ইসহাক ওয়ায়েলী আল-সাফফার রহ. (মৃত্যুঃ ৫৩৪ হি.) ১৩২
ইমাম আবু হাফস উমর নাসাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৫৩৭ হি.) ১৩২
ইমাম নুর উদ্দিন আহমদ আস-সাবুনী রহ. (মৃত্যুঃ ৫৮০ হি.) ১৩২
ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রহ. (মৃত্যুঃ ৫৮৭ হি.) ১৩৩
ইমাম বুরহানুদ্দীন আন-নাসাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৬৮৭ হি.) ১৩৩
ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৭১০ হি.) ১৩৩
ইমাম আকমাল উদ্দিন আল-বাবারতী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৮৬ হি.) ১৩৪
ইমাম সাইয়িদ শরীফ যুরযানী রহ. (মৃত্যুঃ ৮১৬ হি.) ১৩৪
ইমাম কাসেম ইবন কুতলুবুগা রহ. (মৃত্যুঃ ৮৮৯ হি.) ১৩৪
ইমাম ইবনু কামাল পাশা রহ. (মৃত্যুঃ ৯৪০ হি.) ১৩৫
দশমঃ আকিদা পাঠদানের মানহায ১৩৬
আশয়ারী ধারায় প্রাথমিক স্তরে আকিদার প্রসিদ্ধ কিতাব ১৩৬
আশয়ারী ধারায় মাধ্যমিক স্তরে আকিদার প্রসিদ্ধ কিতাব ১৩৮
আশয়ারী ধারায় চূড়ান্ত স্তরে আকিদার প্রসিদ্ধ কিতাব ১৩৯
মাতুরিদী ধারায় প্রাথমিক স্তরে আকিদার পাঠ্য কিতাব ১৩৯
মাতুরিদী ধারায় মাধ্যমিক স্তরে আকিদার পাঠ্য কিতাব ১৪০
মাতুরিদী ধারায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আকিদার পাঠ্য কিতাব ১৪০
মাতুরিদী ধারায় উচ্চস্তরে আকিদার পাঠ্য কিতাব ১৪১
উৎসগ্রন্থ ও তথ্যসূত্র ১৪৩

প্রারম্ভিকা

الحمدُ للهِ ربّ العالمين، والصلاةُ والسلام على سيّدنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبه أجمعين.

"ইসলামী আকিদা শাস্ত্র" ইসলামী শাস্ত্রগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাস্ত্র। কেননা এটা এমন শাস্ত্র যেখানে ইসলামী আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেখানে আল্লাহ তায়ালা ও তার গুণাবলির পরিচয়, তার প্রেরিত রাসূলগণের (আ:) পরিচয় এবং মৃত্যুর পর ব্যক্তির পরিণতি কি হতে পারে তা সম্পর্কে জানা যায়; যাতে করে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে চিরস্থায়ী মসিবত থেকে মুক্তি পায়।

এ কারণে পূর্ব থেকেই 'ইলমুল আকিদা' কুরআন-হাদীস ও বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য প্রমাণ সম্বলিত এবং শরয়ী জ্ঞান শাস্ত্রসমূহের প্রধান ও মূল শাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত। আবার এ শাস্ত্রের অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় এবং মূলনীতিসমূহ দ্বীনি অকাট্য বিষয়াদি সংবলিত। এজন্য আমরা ইসলামী বিদ্বানদের এর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হিসেবে পাই। যার ফলে এ শাস্ত্রে তারা অনেক কিতাব সংকলন করেছেন; যার কোনটি সংক্ষিপ্ত, কোনোটি বিস্তারিত, কোনোটি পদ্য, আবার কোনোটি গদ্য আকারে রচিত। বরং আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামায়ে কেরামকে মুসলিমদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী লেখালেখি করতে দেখি; এই কিছু আছে যা প্রাথমিকদের জন্য উপযুক্ত, আবার ঐগুলো মাধ্যমিকদের জন্য, আবার অন্যগুলো বিজ্ঞজনদের জন্য উপযুক্ত। এ সমস্ত কিতাব ও তার স্তরভেদ মূল আকিদায় এক ও অভিন্ন। আর লেখার ক্ষেত্রে এ স্তরভেদ মূলত উপস্থাপনের ভঙ্গি, বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ এবং সেগুলোর দলীল উপস্থাপনের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। এটা হয়েছে, যেহেতু কিছু মানুষ আছেন যাদের কাছে এমন সংশয় কাজ করে যা অপরের নিকট সংশয় সৃষ্টি

করে না, আবার কিছু আছেন যারা আরও বিস্তারিত হওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন যেগুলো অন্য লেখক শামিল করেননি (আর এ সকল বিষয় সামনে রেখেই তারা গ্রন্থনা করেন)। লিখনের আরেকটি পদ্ধতি হলো, কালাম শাস্ত্রবিদগণের পদ্ধতি; যেখানে তারা প্রতিপক্ষের সংশয় উত্থাপন, সেটার দুর্বলতা বর্ণনা ও খণ্ডন এবং বহুমাত্রিক দলীল ও প্রমাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার দিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

আর আমাদের এ কিতাব এমন সংক্ষিপ্ত যাতে খুব সহজ ভাষায় ইসলামি আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো শামিল করা হয়েছে। সাথে সাথে কোনো দীর্ঘতা বা দুর্বোধ্যতা ব্যতীত এ সকল আকিদার সামগ্রিক প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের ব্যাপারে একটি দিশা পায়।[১]

এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ মুসলিম উম্মতের অধিকাংশের মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আশয়ারী (ও মাতুরিদী) ধারা এবং আকিদার মাসয়ালায় তাদের অনুগামী ধারা অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমরা এ কিতাবে যা পেশ করবো তা কুরআন-সুন্নাহের নুসুস তথা উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত এবং এমন আকলী ও নকলী দলীল সংবলিত যেগুলো আশয়ারী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্যান্য ধারার মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত আকিদার প্রমাণবাহক।

আর কিতাবের শেষে আমরা কিছু ফিকহি মাসয়ালা সংযুক্ত করেছি। যেমন: শুধুমাত্র সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কোন মুসলিমকে কাফের বলার বাস্তবতা, বিদয়াতের তাৎপর্য এবং এ জাতীয় অন্যান্য। এর পিছনে কারণ হলো, কিছু বিরোধপন্থী দাবী করে; এগুলো নাকি আকিদার মাসয়ালা। শুধু তাইনা তাদের নিকট এগুলো হলো কতক মুসলিমকে কাফের এবং আকিদায় বিদয়াতী বানানোর হাতিয়ার। যার কারণে আমরা এগুলোর

---

(১) এ কিতাবের মূল বিষয়বস্তু আমরা আশয়ারি-মাতুরিদি মানহাযে লিখিত ইসলামি আকিদার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে নিয়েছি, আরও নিয়েছি ফিকহের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলি এবং জর্ডান ফতোয়া বোর্ডের আকিদা সংশ্লিষ্ট ফতোয়া ও মাসায়েল থেকে।

আর আমরা এ কিতাবকে ইমাম লাক্কানী (রহ:) এর "জাওহারাতুত তাওহিদ" এর বিন্যাস অনুযায়ী সাজিয়েছি।

উল্লেখ এবং সঠিক মতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি; যদিও তা মৌলিকভাবে আকিদার অংশ নয়। এ পন্থা অবলম্বনে আমাদের আদর্শ হলো, কতিপয় পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের পন্থা, যারা আকিদার কিতাবে ইমামিয়্যাতের মাসয়ালা নিরূপণ করেছেন; যদিও এটি একটি ফিকহী মাসয়ালা।

আর আমাদের এ কিতাবের আঞ্জাম এজন্যই, যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের চিন্তা ফিকিরের ক্ষেত্রে সঠিক দিশার উপর থাকে। আর এটা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত আদেশ পালনার্থেই:

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ١٩ ﴾ [سورة محمد:١٩].

"জেনে রাখুন,(১) আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত"।

তাছাড়া আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে এই বিষয়ের দিকে নিবিষ্ট করার কারণ হলো, ইসলামী আকিদার মূল নীতিগুলোই মজবুত ইসলামী সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ। এর ওপর ভিত্তি করেই মুসলমানদের নিকট চিন্তাগত, ফিকহীগত এবং চরিত্রগত কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদৃঢ় আমল এবং সুবাসময় চরিত্র গঠনে এটাই মূলমন্ত্র। এবং এটাই মুসলিম উম্মার ঐক্য, বিজয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার উৎস। শুধু তাইনা পূর্বাপর সমস্ত কিছু ছাড়াও এটাই কিন্তু কিয়ামত দিবসে নাজাতপ্রাপ্তি এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে সফলতার চাবিকাঠি।

ইসলামী ইতিহাসের পরিক্রমায় এই আকিদার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন কিছু সাচ্চা ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত মনীষী; যারা সত্যকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তমভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। সেই ধারার সর্বপ্রথম হচ্ছেন

---

(১) এখানে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানতে আদেশ করা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানার জন্যই এসকল আকিদার কিতাবের সংকলন। [অনুবাদক]

নবী কারিম ﷺ এর সাহাবীগণ ﷺ, যারা নবী কারিম ﷺ থেকে এটাকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করেছেন। এরপর তাদের পরবর্তীরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন।

ঠিক এমনি এক সময় ইসলামের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ ঘটলো যাদের এমন স্বতন্ত্র দর্শন ও মতবাদ ছিলো যেটা কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মতের উলামাদের ইজমার দর্শনের সাথে অপরিচিত। আর এসকল অদ্ভুত মতবাদের সাথে সাথে কিছু সংশয় ও বিবাদ ইসলামী আকিদায় প্রবেশ করলো। যার কারণে ইসলামী আকিদার প্রতিরক্ষা এবং সমস্ত কালিমা লেপন থেকে মুক্ত করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল, যাতে করে কুরআন-সুন্নাহের বদৌলতে প্রথম যুগের ন্যায় কলঙ্কমুক্ত শুভ্রতায় ফিরে যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আঞ্জাম দেওয়ার জন্য চার ফকীহ ইমাম (১) এবং তাদের যামানার অন্যান্য আলেম জেগে উঠলেন। তারা কতিপয় আকিদার মাসয়ালার বিশ্লেষণ দিতে শুরু করলেন, বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মুনাযারা করলেন, কতিপয় বিষয়ে লেখালেখি ও সংকলন করলেন এবং তার তা'লীমও দিলেন।

এভাবে আকিদা মুসলিম মহলে সুস্পষ্টই ছিল। কিন্তু আকিদা শাস্ত্রের বিশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক, যৌক্তিক ও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজন দেখা দিল; (২) যাতে করে ইসলামী পণ্ডিতগণ যেকোন খোঁড়া দর্শন

---

(১) তারা হলেন: ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. (মৃ. ১৫০হি.), ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালেক রহ. (মৃ. ১৭৯হি.), ইমাম শাফেয়ী আল-মুত্তালেবী রহ. (মৃ. ২০৪হি.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. (মৃ. ২৪১হি.)।

(২) বিশেষকরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদার বিপরীত কিছু গোমরাহী মতের উদ্ভবের কারণে ইলমে আকায়েদের সুসংহতকরনের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। যেমন: তাকদীর অস্বীকারের ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের আকিদা, আবার দেহত্ববাদীদের আকীদা যারা আল্লাহ তায়ালাকে দেহত্বের গুণে গুণান্বিত করে এবং সৃষ্টিবস্তুর সাথে সাদৃশ্য দেয়। (নাউযুবিল্লাহ)।

আবার অন্যদিকে মুরজিয়ারা ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ককে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাখান করে, ফলে তারা বলতে থাকে: ঈমান থাকলে পাপ করলেও কোন সমস্যা নেই। এদিকে খারেযীরা সাহাবীদেরকে ﷺ কাফের সাব্যস্ত করে এবং ঠুনকো অযুহাতে মুসলমানদের রক্ত হালাল করে। শুধু তাই না মুসলিম খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে বৈধজ্ঞান করে।

এবং অবান্তর সংশয়কে খণ্ডনে সক্ষম হন। আর এ মহান ওয়াজিব কাজে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দুইজন মস্তবড় ইমাম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা হলেন: **ইমাম আবুল হাসান আল-আশয়ারী রহ. এবং ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদী রহ.**। উভয়ের প্রত্যেকেই ইসলামী আকিদার দলীল পেশ, সংশয়ের অপনোদন এবং আকিদা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন। আর এই ধারাবাহিকতায় তাদেরকে তাদের পরবর্তী উলামায়ে কেরাম আজ পর্যন্ত অনুসরণ করে আসছেন। ফলে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বনে যান এবং তাদের মতামতগুলো কুরআন-হাদীস ও যুক্তিগত অসংখ্য দলীল ও অকাট্য প্রমাণ থাকা সাপেক্ষে সর্বমহলে সমর্থিত হয়ে যায়।

ইমাম আবুল হাসান আল-আশয়ারী রহ. ছিলেন (মৃ. ৩২১ হি.) হিদায়াতের বাতিঘর, মহান আলেম; যিনি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মুসা আল-আশয়ারীর ﷺ বংশধর। তার নাম: আলী ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবু বিশর ইসহাক ইবনে সালেম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুসা ইবনে বিলাল ইবনে আবু বুরদাহ ইবনে আবু মুসা আল-আশয়ারী ﷺ। ইমাম তাযউদ্দীন আস-সুবকী আশ-শাফেয়ী রহ. বলেন: "জেনে রাখুন! যদি আমরা শায়েখ আশয়ারী রহ. এর সকল কৃতিত্ব সন্নিবেশিত করতে চাই তাহলে কাগজের কমতি ঘটবে এবং দোয়াত কলম ভোঁতা হয়ে যাবে"।(১)

এদিকে আবু মানসুর আল-মাতুরিদী রহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) ছিলেন সমরকন্দ এলাকার। তার নাম: মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আল-হানাফী। তার লকব বা উপাধি হলো "ইমামুল হুদা"। ইমাম সুবকী রহ. বলেন: তিনি ছিলেন মহান ইমাম, দ্বীনের সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব, আকিদায়ে আহলে সুন্নাহের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাকারী। তিনি মু'তাযিলা এবং বিদয়াতীদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন, তাদের সাথে এমন মুনাযারা করেছেন যা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে...। আর তার লালিত মাযহাব ইমাম আজম আবু

---

(১) সুবকী, তাজ উদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে আলি ইবনে আবদুল কাফি (মৃ: ৭৭১ হি.), *ত্বাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ আল কুবরা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, (তাহকীক: মুহাম্মদ আত্-তনাহী ও আব্দুল ফাত্তাহ আল হালউই), হাজর লিত্বাবায়াতি ওয়ান নশর ওয়াত তাওযি, ১৪১৩ হিজরী, খ ৩, পৃ ৩৫১।

হানিফা এবং তার দুই শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মাযহাবেরই প্রতিনিধিত্ব করতো (১)

আকিদা শাস্ত্রের আলেমগণের ইমাম আশয়ারী ও মাতুরিদী রহ. এর দিকে নিসবত করার তাৎপর্য:

জানা উচিত, ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী এমন কোনো কিছুই বর্ণনা করেন নাই যা কুরআন-সুন্নাহের বিপরীত, বরং তাদের কাজই ছিল প্রিয় নবী ﷺ, তার সাহাবা এবং প্রথম তিন যুগে তাদের অনুসারীদের পন্থামতে কুরআন-সুন্নাহে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আকিদার প্রতিরক্ষা করা। ফলে উভয়ে উক্ত শাস্ত্রে কিতাব লিখেন, প্রতিপক্ষদের সাথে মুনাযারা করেন। এবং মুমিনদেরকে ঐ সহীহ আকিদায় দৃঢ় রাখতে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উক্ত কাজে যথেষ্ট ক্ষমতা দান করেন, উভয়কে সর্বোত্তম সাহায্য করেন। অতঃপর তাদের রজ্জুতেই উম্মতের ধারাবাহিকতা অতিক্রান্ত হতে থাকে। আর উম্মতের সকল লোকের এ দুই ইমামের উপর ঐক্যমতই তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও কর্মের বিশুদ্ধতাকে সুদৃঢ় করে। কেননা উম্মাহ ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যমত হতে পারে না যেমনটা নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। আর দুই ইমামের মধ্যকার পার্থক্য খুব কম। আর যাও আছে তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লফযী (অর্থাৎ শব্দগত। মর্ম তথা তাৎপর্যগত নয়) অর্থাৎ যেসকল উলামাবৃন্দ তাদের মধ্যকার বিরোধ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাদের কাছে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট, শুধু তাইনা এ ব্যাপারে তারা প্রসিদ্ধ কিতাবও লিখেছেন। (২)

---

(১) প্রাগুক্ত, খ ৩, পৃ ৩৫১।

(২) যেমন: ক. আল্লামা ইবনু কামাল পাশা (মৃ. ৯৪০ হি.) রচিত (مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية)। খ. আল্লামা শায়খ যাদাহ আব্দুর রহমান ইবনে আলী রহ. (মৃ. ১০৭৮ হি.) লিখিত (نظم الفرائد وجمع الفوائد)।

গ. ইবনে আবি উযবাহ নামে প্রসিদ্ধ আল্লামা হাসান ইবনে আব্দুল মুহসিন রহ. (মৃ. ১১৭২ হি.) লিখিত (الروضة البهية في ما بين الأشاعرة والماتريدية)। [অনুবাদক]

আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের হাদীস বিশারদগণ ইমাম আশয়ারী রহ. ও তার সতীর্থদের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে দেখা যায় তারা তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে দোয়া ও রহমতের প্রার্থনা করেছেন। এই দেখুন না বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বায়হাকী রহ. তার বৃহৎ কিতাব "আল-আসমা ওয়াস সিফাত" কিতাবের বহু স্থানে ইমাম আশয়ারী ও ইবনু ফুরাক রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি তাদের বুঝ এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্তুষ্টচিত্তে একত্বতা পোষণ করে বর্ণনা করেছেন। আর এটা এজন্যই যেহেতু তাদের আকিদা বিশুদ্ধ ছিলো।

এদিকে হাফিয ইবনু আসাকির রহ. ইমাম আশয়ারী ও মাতুরিদীর রহ. কর্মকে খুব চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তিনি বলেন:"... তো এভাবে পালাবদল হলো আমাদের শায়েখ আবুল হাসান আশয়ারীর রহ. কাছে। তিনি দ্বীনের মাঝে নতুন কোন কিছুই সৃষ্টি করলেন না, কোন বিদয়াতও নিয়ে আসলেন না। বরং সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাদের পরবর্তী উসুলুদ্দীন শাস্ত্রে যারা ইমাম তাদের মতামতগুলো গ্রহণ করলেন। সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বৃদ্ধি করে আরো সুদৃঢ় করলেন। আকিদার মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে তারা যা বলেছেন এবং শরীয়তে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিবাদীরা যে দাবী করে: "এগুলোর কিছু কিছু নাকি বিবেকসিদ্ধ না", এ মন্তব্যের বিপরীতে গিয়ে এগুলোও যে বিবেকসিদ্ধ তা প্রমাণ করলেন। ফলে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তার পূর্ববর্তী বহু ইমামের মতামতগুলো সুদৃঢ় হয়ে যায়; (সে সকল ইমাম) যেমন: কুফাবাসীদের মধ্যে ইমাম আজম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, শামবাসীদের থেকে ইমাম আওযায়ী ও অন্যান্যরা, হারামাইন অধিবাসীদের থেকে ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং তাদের উভয়ের শাগরেদ। আবার হাদীস বিশারদদের মধ্য থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-সহ অন্যান্যরা। অনুরূপভাবে লাইছ ইবনে সা'দ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিস, শুধু তাই না শরীয়তের অন্যতম মূল ভিত্তি নবীর সুন্নাহের অতন্দ্র প্রহরী, হাদীস শাস্ত্রের দুই মহান ইমাম; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী ও আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নাইসাবুরী রহ. প্রমুখ।

আর এ উম্মতে ইমামদের মধ্য থেকে যারাই প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং জ্ঞান গবেষণায় পূর্বযুগে ও আধুনিকযুগে আহলে সুন্নাহের মধ্যমণি হয়েছিলেন তাদের সবার কর্মপন্থা ঐ রকমই ছিলো। আর এদের ব্যাপারেই নবী কারীম ﷺ তার উম্মাহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; যা তার থেকে তার সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: "আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর গোড়ায় এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যিনি উম্মার জন্য দ্বীনকে পুনর্জীবিত করবেন"(১)।

এই দুই মহান ইমাম (ইমাম আশয়ারী ও মাতুরিদীর) পরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বহু ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ইলমুল কিরায়াত ও আরবী ভাষার বোদ্ধাগণ এসেছেন। আরো এসেছেন ইসলামী আকিদা ও উসূলে ফিকহের উলামাগণ, যেমন:

ইমাম বাকিল্লানী	হাফেয ইবনু ফুওরাক
আবু আমর আদদ্বানী	মক্কী ইবনে আবু তালিব
ইমামুল হারামাইন যুয়াইনি	হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী
ইমাম নাসাফী	ফখরুদ্দীন রাযী
আদুদ দ্বীন ইযী	মহীউস সুন্নাহ বাগাভী
আল-আলা আল বুখারী	মুহীউদ্দীন ইমাম নববী
ইবনু হাযার আসকালানী	হাফেয ইমাম বায়হাকী
ইমাম সাখাভী	ইমাম সুয়ূতী
ইমাম বায়যাবী	ইমাম ইরাকী
ইমাম ইয ইবনে আব্দুস সালাম	ইমাম কামাল ইবনুল হুমাম রহ.

সহ আরো বহু ইমাম, যাদের উল্লেখ অনেক দীর্ঘ হবে; তারা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর ছিলেন; হয়তোবা আশয়ারী নতুবা মাতুরিদী। তারা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুই সৃষ্টি করেন নি বরং তারা হলেন সবার কাছে একাধারে সমাদৃত এবং পুরো মুসলিম জাতির হিদায়াতের দীপিকা।

---

(১) ইবনু আসাকির (মৃ. ৫৭১ হি.), *তাবঈনু কাযিবিল মুফতারি*, (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৪ হি.) ৩য় সংস্করণ, পৃ.১০৩।

আর যখন উম্মাহের পূর্বসূরীগণ কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের ঐক্যমতকে আঁকড়ে ধরে সঠিক পন্থায় চলেছেন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যুগ পরম্পরায় তাদেরই অনুসরণ করে চলে এসেছেন, তখন আমাদের জন্য অধিক উপযোগী এবং অধিক সমীচীন হলো এই মোবারাক ইলমী পথে অব্যাহত থাকা, এ সুপ্রতিষ্ঠিত অকাট্য নীতিমালাকে আঁকড়ে ধরা এবং যেই ধারার উপর আমাদের পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামগণ গত হয়েছেন সে ধারায় অবিচল থাকা। যাতে করে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

আল্লাহ তায়ালার কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এই সংক্ষিপ্ত কিতাবের মাধ্যমে ইসলামী আকিদার উপকার সাধন করেন, যেভাবে ইমাম আশয়ারী ও ইমাম মাতুরিদীর (রহ.) অনুসারী উম্মাহের চার মাযহাবের গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের কার্যপন্থা দ্বারা উপকৃত করেছেন।

আকিদার মাসয়ালাগুলোকে এ কিতাবে আমরা তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশ করে বিন্যস্ত করেছি:

ক. ইলাহিয়্যাত (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত আকিদা)।

খ. নবুয়্যাত (নবী-রাসূল সম্পর্কিত আকিদা)।

গ. সামঈয়্যাত (কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত অন্যান্য আকিদা)।

এরপর প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীন ঐ অধ্যায়ের সম্পৃক্ত নানা মাসয়ালার শিরোনাম অবতারণা করেছি। তবে আমরা এ সমস্ত অধ্যায়ের পূর্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ঈমানের মর্মকথা ও তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ একটি ভূমিকা পেশ করেছি। কেননা একজন বিবেকবানের উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হলো ঈমান নিয়ে জানা।

والحمدُ للهِ ربِّ العالَمِين.

মুখবন্ধ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ঈমানের মর্মকথা

ইসলামী শরীয়ত **মুকাল্লাফদের** (১) উপর আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জানা আবশ্যক করেছে। অনুরূপভাবে ঈমানের আরকানসমূহ জানাও আবশ্যক করেছে। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তাদের উপরোক্ত পরিচয়লাভ অত্যন্ত সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

অর্থ: "তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই"।

ইসলামে আবশ্যিক শিক্ষা হচ্ছে কালিমায়ে শাহাদাত (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ ورسولُه) এর দাবীকৃত বিষয়ের উপর ঈমান আনা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে এমনভাবে বিশ্বাস করা যে, তিনি সমস্ত ত্রুটিমুক্ত প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত, তার শানে সব ধরণের ত্রুটি ও দুর্বলতা অপ্রযোজ্য, এবং তার সমস্ত কর্মাবলি তার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় সংগঠিত হয়। সাথে সাথে নবী কারীম ﷺ কে নিষ্কলুষ স্বীকৃতি ও আনুগত্যের সাথে

---

(১) **আকিদাশাস্ত্রে মুকাল্লাফ হলো:** প্রত্যেক ঐ সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তি যার নিকট ইসলমী দাওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছেছে। অথ্যাৎ ব্যক্তি নিম্নোক্ত তাওহীদের বাণীর মর্মকথা সম্পর্কে অবগত হয়েছে: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ)। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, শরীয়তের বিষয়াবলি পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি।
নোট: মুকাল্লাফ শব্দের তাৎপর্য স্মরণ রাখা অত্যন্ত জরুরী। কেননা সামনে এ পরিভাষার ব্যবহার বহুস্থানে আসবে। [অনুবাদক]।

আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে সত্যায়ন করা। পাশাপাশি তিনি আমাদের নিকট যা পৌঁছে দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা।

আর এ ঈমানী জ্ঞান ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না তা সুদৃঢ়ভাবে জানা হয়। এজন্য সামগ্রিকভাবে এর দলীলসমূহ জানা আবশ্যক। আর একজন মুসলিম সংশয়, ধারণা এবং আন্দাজের উপর ভিত্তি করে মুসলিম হবে, তা উপযুক্ত নয়। আর এ ভিত্তিকে আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে তার পরিচয় লাভ হয়েছে অথবা তার ব্যাপারে সুদৃঢ় জ্ঞানলাভ হয়েছে বলে গণ্য করা যায় না। কেননা কোন বিষয়ের ব্যাপারে ব্যক্তি যদি সংশয় বা ধারণা পোষণ করেন তাকে তো ঐ বিষয়ে আলেম বলা হয় না। এখন ধরা যাক, একজন মুকাল্লাফ আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অনুমান বা সংশয়ের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করলো, তাহলে তার এ সাবস্ত্যকরণ গ্রহণযোগ্য নয়। উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জিত হয়েছে বলেও গণ্য নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ۞ قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ أَفِي ٱللَّهِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَدۡعُوكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرَكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ ١٠ ﴾ [سورة إبراهيم: ١٠]

অর্থ: "তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেন, আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে? যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাতে তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন"।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكۡثَرُهُمۡ إِلَّا ظَنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا يَفۡعَلُونَ ٣٦ ﴾ [سورة يونس: ٣٦]

অর্থ: বস্তুত তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে"।

এখানে জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত একজন মুকাল্লাফের উপর বিভিন্ন দলীল ও মাসয়ালা

বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করাকে শর্ত করে নাই। বরং সামগ্রিক (ইজমালী) পর্যবেক্ষণ আবশ্যক করেছে। আর এ আবশ্যকতা থেকে সাধারণ মানুষও দায়মুক্ত নয়। সুতরাং প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে -যদিও তা মুখে উচ্চারণ না করেন- তাদের স্ব-স্ব অবস্থান ও সক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের সত্যতা উপলব্ধি করা আবশ্যক। এখন ধরুন, এমন মুকাল্লাফ পাওয়া গেল যিনি এ নিয়ে একেবারেই চিন্তা ফিকির করেননি অর্থাৎ, কোন দলীল তালাশ করেনি বরং তিনি নিরেট মুকাল্লিদ (অন্ধভক্ত) (১), তাহলে এ ধরনের ব্যক্তিকে উলামায়ে কেরাম শরীয়তের শাখাগত আবশ্যিক বিষয়ে ত্রুটিকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। এর ফলে সে পাপী মুমিন হবে। আর ইমাম আদুদ্দিন ঈজী (রহ.) সামগ্রিক পর্যবেক্ষণেই (নয্‌রে ইজমালী) যথেষ্ট বলে ইশারা দিয়েছেন। তিনি বলেন: "সুতরাং যিনি প্রকৃতপক্ষে সত্যায়নকারী হবেন তিনি বস্তুত ঐ সকল বিষয়ে দৃঢ় জ্ঞান রাখেন বলে পরিগণিত হবেন। যদিও তার দলীল-আদিল্লা নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সম্পাদন না থাকে। কেননা সুদৃঢ় জ্ঞানলাভ এবং তাকলীদের গণ্ডি থেকে বের হওয়ার জন্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দলীল অবগত হওয়া শর্ত নয়" (২) (বরং নযরে ইজমালী ইলমী দৃঢ়তা অর্জনে যথেষ্ট। এখন ব্যক্তি যেই তরীকায় তা অর্জন করুক না কেন)।

---

(১) **তাকলীদ হলো:** অপরের মতামত ও আকিদা বিশ্বাসকে কোনরূপ দলীল ও প্রমাণ ব্যতীত এমনভাবে বিশ্বাস করা যদি অনুসৃত ব্যক্তির মতামত পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে মুকাল্লিদ তার এ অন্ধঅনুকরনে সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে সে এমন হয়রান ও সন্দিহানে নিপতিত হয় যেখানে হক্ব-বাতিলকে চিনতে পারে না। আর এজন্যই পর্যাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করা প্রত্যেক মুকাল্লাফের উপর আবশ্যক। কেননা একজন মুসলিমের আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরন চরম ঝুঁকির, এবং এটা অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সংশয় ও সন্দিহানের দিকে ধাবিত করে।

(২) শরীফ জুরজানী, আলী ইবনে মুহাম্মদ আল- জুরজানী (মৃ: ৮১৬ হি.), *শরহুল মাওয়াকেফ* (মিসর: মাতবায়াতুস সায়াদাহ, ১৩২৫ হি.) খ ৮, পৃ ৩৩৩।

[একজন বিবেকবানের উপর সর্বপ্রথম কর্তব্য আল্লাহর পরিচয় লাভ করা]

একজন মুকাল্লাফের উপর সর্বপ্রথম আবশ্যিক কর্তব্য হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং অন্তরে দৃঢ়ভাবে এ মর্মে বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা চির বিদ্যমান, তিনি একক তার কোন শরীক নেই, তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি সমস্ত ত্রুটিমুক্ত গুণে গুণান্বিত, ত্রুটিযুক্ত গুণাবলি থেকে চিরমুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ অর্থ: "জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই"। একজন মুকাল্লাফের জন্য এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কোন ক্রমেই জায়েয নেই। কেননা এটা হলো এমন সামগ্রিক বিশ্বাস যা প্রত্যেক মানুষ থেকে তলবকৃত।

আর আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়নের আবশ্যকতা মূলত স্পষ্ট দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হওয়া অপরিহার্য। কেননা অপরের অন্ধঅনুকরনের মাধ্যমে ঈমান আনার বৈধতা নেই। আর এ পৃথিবী হলো আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কেননা আমাদের পঞ্চেন্দ্রীয় দ্বারা অনুধাবনকৃত এ সৃষ্টজগতের অস্তিত্বকে কোন অস্তিত্বদানকারী ব্যতীত স্বীকার করা, এবং কোন সৃষ্টবস্তুকে সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত স্বীকার করা কোন জ্ঞানবানের পক্ষে সম্ভব না। আর সেই সৃষ্টিকর্তাই হলেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি ইরশাদ করেন:

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾

অর্থ: "তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত কর"।

এর আরও প্রমাণ হলো: আমাদের চারপাশের এ মহাজগৎ অত্যন্ত সুগঠিত ও সুদৃঢ় এবং সাথে সাথে অনেক রহস্যময়। অথচ এত কিছু থাকার পরও কি সুনিপুণভাবে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে! আর এ ব্যাপক বিষয়গুলো কোন নিরূপণকারী, নিয়ন্ত্রণকারী এবং এসকল বিষয় সম্পর্কে অবগত সত্তা ব্যতীত এমনিতেই পরিচালিত হতে পারে; তা কখনই বোধগম্য নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ۝٢ ﴾ [سورة الفرقان:٢].

অর্থ: তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুনির্ধারণ করেছেন পরিমিতভাবে।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও পরিচয় লাভের ব্যাপারে কেউই প্রমাণ থেকে খালি নয় (অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকটই আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন না কোন প্রমাণ বিদ্যমান)। আর সকল মানুষ তার সেই প্রমাণ তার সক্ষমতা অনুযায়ীই উপস্থাপন করে। এই যে এক বেদুইন আল্লাহর অস্তিত্ব এভাবে নিরূপণ করেছেন: "কোন নির্দেশিকা কোন একটি পথের নির্দেশ করে, উটের বিষ্ঠা সেখানে উটের বিদ্যমানতাকে নির্দেশ করে। তো এই যে সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশ, গিরিপথ বিশিষ্ট জমিন, তরঙ্গ বিশিষ্ট সমুদ্র; এগুলো কি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা একজন সত্তার নির্দেশ করে না"?!

[আল্লাহ কর্তৃক মানুষের উপর আবশ্যিক ঈমানের মর্মকথা]

ঈমান হচ্ছে একজন মুমিনের উপর সর্বপ্রথম আবশ্যিক কর্তব্য; এ আলোচনা গত হওয়ার পর আমাদের উপর আবশ্যক হলো ঈমানের মর্মকথা বিশ্লেষণ করা। তো বলছি:

মানুষ থেকে তলবকৃত মৌলিক ঈমান হলো: কোন সংশয়-সন্দেহ ব্যতীত অন্তরে এমন সত্যায়ন করা যাতে করে আল্লাহ তায়ালাই হক্ব, ইসলামই হক্ব এবং আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে সমস্ত বিষয় নিয়ে এসেছেন সেগুলোই হক্ব ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থাশীল ও আজ্ঞানুবর্তী হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ﴾ [سورة النساء:١٣٦].

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর"।

আর যিনি এ মৌলিক বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হতে পারবেন তিনিই জাহান্নামের চিরস্থায়িত্বতা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন।

আর অন্তরের সত্যায়নই যে ঈমানের মূল এর দলীল হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ [سورة المجادلة:٢٢]

"তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা"।

অন্তরের মাঝে যে ঈমান লিখে দেওয়া হয় সেটা অন্তরের সত্যায়ন ব্যতীত ভিন্ন কিছু নয়। আবার আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউসুফ (আ:) এর ভাইদের কথার সংবাদকল্পে বলেন:

﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ [سورة يوسف:١٧]

"আর আপনি আমাদের প্রতি ঈমান রাখবেন না"। অর্থাৎ আপনি আমাদের কথার সত্যায়ণকারী নন।

কখনো কখনো পরিপূর্ণ ঈমানের তাৎপর্য ব্যক্ত করা হয় এই বলে যে, ঈমান হলো "অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে কর্মে প্রতিফলন"। এই পরিচয় প্রদানও বিশুদ্ধ। তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে, এটা খাঁটি ঈমানের সংজ্ঞা, মূল ঈমান যে তাসদীক (বা সত্যায়ন) সেটার সংজ্ঞা নয়।

কোন কোন মুসলিম আবার বিস্মিত হতে পারে যে, মূল ঈমান হলো শুধুমাত্র তাসদীক (বা অন্তরে বিশ্বাস), আর এর মধ্যে বুঝি মুখের স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্ম সন্নিবেশিত হবে না! তো আমরা তার বিস্ময় রোধনে বলি: এখানে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা কুরআন-সুন্নাহ এই মর্মার্থেরই নির্দেশ করে এবং এটা সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈদের (রহ.) মত। শুধু তাই না বরং চারো মাযহাবের প্রাচীন বিশ্বস্ত উলামায়ে কেরামের মত এটাই। সুতরাং কোন সংশয়বাদীর সংশয়ের কারণে অথবা কোন হতবুদ্ধিওয়ালার হতবুদ্ধিতার কারণে এই মর্ম ত্যাগ করতে পারি না।

এখন আমরা এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহের কিছু দলীল-আদিল্লা এবং বরেণ্য উলামায়ে কেরামের বক্তব্য পেশ করবো:

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾﴾ [سورة النساء:٤٨]

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল"।

শির্ক হলো, আল্লাহর সাথে কোন অংশীদারের বিশ্বাস রাখা। আর যেকোন অবাধ্যতা ও উত্তম আমল পরিত্যাগ সুনিশ্চিতভাবে শিরকের নিম্নবর্তী এবং সেগুলোর ক্ষমা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। সুতরাং সেগুলো কুফর হিসেবে ধর্তব্য হবে না এবং কুফর আবশ্যককারী আমল হিসেবেও পরিগণিত হবে না। তার মানে এটাই বুঝা গেলো, যে ঈমানের মাধ্যমে মানুষ নাজাত পাবে তা হলো অন্তরের বিশ্বাস।

২. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴿١٠٦﴾﴾ [سورة النحل:١٠٦]

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি"।

৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ﴾ [سورة المجادلة:٢٢]

"তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা"।

৪. আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ ﴾ [سورة الحجرات:١٤]

"মরুবাসীরা বলে: আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন: তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি"।

পূর্ববর্তী এসকল আয়াত ঈমানকে অন্তরঙ্গ হিসেবে পেশ করেছে, আর এটা ব্যতীত অন্যান্য কিছু ঈমানের ঐ মৌলিকত্বে প্রবেশ করবে না যা চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম হতে পারে।

তো এসকল আয়াত নির্দেশ করে, ঈমান প্রকৃতপক্ষে অন্তরে বা বক্ষে হয়ে থাকে। আর এটাই হলো অন্তরগত বিশ্বাস বা সত্যায়ন (التصديق القلبي)।

৫. (আরো দলীল হলো) শাফায়াতের সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস সমূহ; যেগুলো একজন মুমিনের জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা দেয়, অথচ সে তার জীবনে কখনও কোন ভালো আমল যেমন: নামায, রোযা, যাকাত অথবা অন্যান্য কোন আবশ্যিক বা নফল কাজ করেছে বলে নজির নেই। এ মর্মে অনেক হাদীস রয়েছে, যেমন: হযরত আনাস ﷺ নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "নবী ﷺ বলেছেন: যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং যে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান থাকবে তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমানও ঈমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আবূ আবদুল্লাহ বলেন,

আবান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আনাস ﷺ হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে خير -এর স্থলে 'إيمان' শব্দটি বর্ণনা করেছেন"। (সহীহ বুখারী, ৪৪)

৬. শাফায়াতের অন্য একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে যেটা হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ বর্ণনা করেছেন: ...তখন জান্নাতবাসীরা বলবে: এরা হলেন মহাসত্তা রহমান কর্তৃক আযাদকৃত; যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোন আমল কিংবা সৎকর্ম ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অতপর তাদেরকে বলা হবে: যা দেখছো সবই তোমাদের, এর সাথে সাথে আরো সমপরিমাণ তোমাদের দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারী, ৭৪৩৯)।

এ হাদীসে আমল না থাকা সত্তেও মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান, যেহেতু তাদের কালিমায়ে শাহাদাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

৭. আবার যেমন হযরত আবু যর ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেছেন: "একজন আগন্তুক [অর্থাৎ জিব্‌রীল (আলাইহিস সালাম)] আমার প্রতিপালকের নিকট হতে এসে আমাকে খবর দিলেন অথবা তিনি বলেছেন -আমাকে সুসংবাদ দিলেন- : আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন: যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে। (সহিহ বুখারী, হাদীস নং: ১২৩৭)।

৮. হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন: "জনৈক লোক যে জীবনে কখনো কোন সাওয়াবের কাজ করেনি, সে তার পরিবার পরিজনকে ডেকে বলল: যখন সে মারা যাবে তখন যেন তারা তাকে পুড়িয়ে দেয়; সেটার অর্ধেক স্থলভাগে বাতাসে উড়িয়ে দিবে এবং অর্ধেক পানিতে নিক্ষেপ করবে। কারণ আল্লাহর কসম! তিনি যদি তাকদ্বীর নির্ধারণ করেই থাকেন তাহলে তিনি আমাকে অবশ্যই এমন 'আযাব দিবেন, যা পৃথিবীর অন্য কাউকে কখনো দেননি। তারপর লোকটি যখন ইন্তিকাল করল তখন তার পরিবারের লোকেরা তার নির্দেশ অনুযায়ী তদ্রুপ করল। তখন আল্লাহ তাআলা স্থলভাগকে আদেশ দিলেন; সে তার মধ্যস্থিত ছাই

একত্রিত করলো। এরপর পানিতে মিশ্রিত ভাগকে নির্দেশ দিলেন; সেও তার মধ্যস্থিত ছাই একত্রিত করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি এমনটি কেন করলে? সে বলল, হে আমার রব! আপনার ভয়ে। আপনি তো সর্বজ্ঞ। তখন আল্লাহ তা'আলা সদয় হয়ে তাকে মাফ করে দিলেন"। (সহীহ মুসলিম, ২৭৫৬)।

৯. অন্যত্র হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ জনসম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঈমান' কি? তিনি বললেন, 'ঈমান হলো, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, (ক্বিয়ামাতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি"। (সহীহ বুখারী, ৫০)।

১০. হযরত ওসমান ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি মারা যায় অথচ সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

১১. আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত: "একদা মু'আয (রা:) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সওয়ারীতে ছিলেন, তখন তিনি তাকে ডাকলেন, হে মু'আয ইব্নু জাবাল! মু'আয ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার সার্বিক সহযোগিতা ও খেদমতে হাযির আছি। তিনি ডাকলেন, মু'আয! মু'আয ﷺ উত্তর দিলেন, আমি হাযির ও প্রস্তুত- হে আল্লাহর রাসূল। তিনি আবার ডাকলেন, মু'আয। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হাযির এবং প্রস্তুত'। এরূপ তিনবার করলেন। অতঃপর বললেন: যে কোনো বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল'-তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। মু'আয বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি মানুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপরই ভরসা করবে।' মু'আয ﷺ (জীবন ভর এ হাদীসটি বর্ণনা

করেননি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইলম গোপন রাখার) গুনাহ না হয়। (সহীহ বুখারী: ১২৮)।

যে সকল হাদীস আমরা উল্লেখ করলাম এ সমস্ত কিছু এটাই নির্দেশ করে, সৎকর্ম ও আনুগত্য মৌলিক ঈমান বর্হিভূত এবং এটা ঈমানের মৌলিক অংশ বা রুকন নয়। কাজেই যার কাছ থেকে মৌলিক বিশ্বাস পাওয়া যাবে কিন্তু আমল পাওয়া যাবে না; সে ব্যক্তি এসমস্ত হাদীস এবং পূর্বোল্লেখিত আয়াতে কারীমাহ অনুযায়ী কাফের না।

তাছাড়া আমরা যে উল্লেখ করেছি, 'মূল ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস' এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতেরও সম্মেলিত মত (তথা ইজমা)।

তাদের মধ্য থেকে **ইমাম ত্বারী** (রহ.) বলেন: "এক্ষেত্রে আমাদের নিকট সঠিক মত হলো, ঈমান হচ্ছে, অন্তরে বিশ্বাসের নাম যে রকম আরব ভাষাবাসীরা বুঝে থাকে। শুধু তাই না, আল্লাহ তায়ালার কিতাবেও এর উল্লেখ হয়েছে, যেটা ইউসুফ ﷺ এর ভাইদের তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব ﷺ কথোপকথনের বর্ণনা সম্পর্কে এসেছিল:

﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ ١٧ ﴾ [سورة يوسف:١٧]

"আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী"।

অর্থাৎ আপনি তো আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে সত্যায়নকারী নন। তবে স্বাভাবিকভাবে যেই মর্মার্থের ভিত্তিতে মুমিন নামটি ব্যবহারের উপযুক্ত তা হলো, ঈমানের সমস্ত মর্মার্থের সম্মিলন ঘটা। আর তা হলো আল্লাহ তায়ালার বর্ণনাকৃত সমস্ত ফরয আহকামের পরিচয়, স্বীকৃতি এবং আমলের মাধ্যমে প্রতিপালন ঘটানো"।(১)

তাফসীর শাস্ত্রবিদ বিশিষ্ট ইমাম **ইবনে কুতাইবা (রহ.)** বলেন: "ঈমান হলো তাসদীক (অন্তরের সত্যায়ন)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

(১) ত্বারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর (মৃ: ৩১০ হিঃ), *আত-তাবসীর ফি মায়ালিমিদ্দিন*, (দারুল আসেমাহ, ১৪১৬ হি.) ১ম সংস্করণ, তাহকীক: আলী আশ-শাবল, পৃ. ১৯০।

﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ ١٧ ﴾ [سورة يوسف:١٧]

"আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী"। অর্থাৎ, আপনি আমাদের সত্যায়নকারী নন।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ وَإِن يُشۡرَكۡ بِهِۦ تُؤۡمِنُواْ ﴾ [سورة غافر:١٢]، أي: تُصَدِّقوا.

"তোমাদের বিপদটি এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফের হয়ে যেতে যখন তার সাথে শরীককে ডাকা হত তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে"। অর্থাৎ, তোমরা সত্যায়ন করতে।

(আবার বলা হয়): (العبد مؤمنٌ بالله، أي مصدِّقٌ) বান্দা আল্লাহর ব্যাপারে বিশ্বাসী, অর্থাৎ সত্যায়নকারী। আবার বলা হয়: (الله مؤمنٌ); অর্থাৎ তিনি যে সকল কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার সত্যায়নকারী বা বাস্তবায়নকারী, অথবা ব্যক্তির ঈমান কবুলকারী। অনেক সময় কথোপকথনের ক্ষেত্রে বলা হয়: (ما أومن بشيء مما تقول، أي ما أصدِّق به) আমি তোমার কোন কথায় বিশ্বাস করি না; মানে আমি এর সত্যায়ন করি না। (১)

মহান ইমাম আবু আমর আদ-দানী (রহ.) বলেন: আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মর্মকথা হলো, অন্তরে অন্তরে এমন সত্যায়ন করা যে, আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, তিনি অনাদী, সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞানী। যিনি এমন সত্তা; কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আর ঈমান যে মুখে স্বীকৃতি ও অন্তরে সত্যায়নের সমষ্টি এর দলীল হলো, আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী: "আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী" (সুরা ইউসুফ: ১৭)। অর্থাৎ এর উদ্দিষ্ট মর্ম

(১) ইবনু কুতাইবা, আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম দিনুরী (মৃ: ২৭৬ হিঃ), *তা'বিলু মুশকিলিল কুরআন,* (বৈরুত: দারুল কুতুব ইলমিয়াহ) ১ম সংস্করণ, তাহকীক: ইবরাহীম শামসুদ্দীন, পৃ. ২৬৩।

হলো, আপনি আমাদের সত্যায়নকারী নন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী: "তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফের হয়ে যেতে, যখন তার সাথে শরীককে ডাকা হত তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে" (সুরা গাফির: ১২)। অর্থাৎ, তোমরা সত্যায়ন করতে।

আবার অন্যত্রে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾﴾ [سورة البقرة:٢٤٨]

"তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে"। অর্থাৎ, তোমরা যদি পরিপূর্ণ সত্যায়নকারী হয়ে থাক। (১)

প্রখ্যাত ইমাম ক্বারী মুফাসসির মক্কী ইবনে আবু তালিব (রহ.) একাধিক স্থানে উল্লেখ করেন: "ঈমানের মূল হলো, অন্তরের সত্যায়ন" (২)। অন্যস্থানে আবার তিনি বলেন: "ঈমান হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে যা এসেছে তা সত্যায়ন করা"। (৩)

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, হাফিয ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন: "আর আমল হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা। অর্থাৎ ঈমানের স্বীকৃতির শর্তে আনুগত্য করা। সুতরাং এর বিপরীত হলো বিরোধিতা ও অবাধ্যতা, কুফুর না"। (৪)

---

(১) আবু আমর দানী, ওসমান ইবনে সাঈদ (মৃ: ৪৪৪ হিঃ), *আর রিসালাতুল ওয়াফিয়াহ লি মাযহাবি আহলিস সুন্নাহ,* (কুয়েত: দারুল ইমাম আহমদ, ১৪২১ হি.), ১ম সংস্করণ, তাহকীক: দাগশ আল-আজমী, পৃ. ১১৯।

(২) কায়সী, আবু মুহাম্মদ মক্কী ইবনে আবু তালিব কুরতুবী আল-মালেকী (মৃ: ৪৩৭ হিঃ), *আল হিদায়া ইলা বুলুগিন নিহায়া,* (জামেয়াতুস শারেকাহ: কুল্লিয়াতুস শরীয়্যাহ ওয়াদ দিরাসাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪২৯ হি.), ১ম সংস্করণ, খ. ১, পৃ.১৩০ ও খ. ৯, পৃ ৫৮৩৫।

(৩) প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৭০১৪।

(৪) বায়হাকী, আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল-খুরাসানী (মৃ: ৪৫৮ হিঃ), *শুয়াবুল ঈমান,* (মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৩ হি.) ১ম প্রকাশ, খ. ১, পৃ. ৯২।

আমরা যে বিশ্লেষণ করলাম, ঈমান হলো তাসদীক বা সত্যায়ন; এর উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সম্মিলিতভাবে হুকুম দিয়েছেন, কবিরা গুনাহকারী মুমিন এবং তারা তাকে দ্বীন থেকে খারিজ করেননি। ইমাম নববী রহ. বলেন: "জেনে রাখুন, আহলুল হক্কদের পন্থা হলো, কাবার অনুসারী কাউকে পাপের কারণে কাফের না বলা এবং প্রবৃত্তিন্বেষী ও বিদয়াতীকেও কাফের বলা হবে না। আর যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের জরুরী বিষয় অস্বীকার করলো তার ব্যাপারে মুরতাদ এবং কাফের এর হুকুম দেওয়া হবে। তবে ব্যক্তি যদি সবেমাত্র মুসলিম হয়, অথবা কোন সমাজ বিছিন্ন স্থানে বেড়ে উঠে বা এ জাতীয় যাদের পরিচয় সুস্পষ্ট নয় তাদের ব্যাপারে এই হুকুম এড়িয়ে চলা হবে..." ।[১]

পূর্বাপর সকলের মতে ঈমানের মৌলিকত্ব হলো তাসদীক (বা অন্তরে বিশ্বাস)

সালাফদের থেকে প্রসিদ্ধি আছে যে তারা বলেছেন: ঈমান কথা ও কর্মের সমষ্টি। এ কথা বিশুদ্ধ এতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এ কথার তাৎপর্য আমরা কীভাবে উপলব্ধি করবো? এ কথার তাৎপর্য অবশ্যই সহীহ-শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করতে হবে, যাতে কোন মুসলিম স্ববিরোধিতার বেড়াজালে আটকে না যায় অথবা পূর্বসূরী কারো প্রতি অভিযোগ দিয়ে না বসে অথচ এর থেকে তারা পবিত্র। আসুন আমরা এর বিশ্লেষণে আসি:

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রহ. এ ব্যাপারে সালাফদের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্নকারীর ভাষায় বলেন: সালাফদের থেকে এ মত প্রসিদ্ধ যে, ঈমান হলো, অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও আমলে রূপদান; এর তাৎপর্য কি? এর জবাবে আমরা বলি: আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্তির বহির্ভূত নয়। কেননা তা তার পরিপূর্ণকারী ও সম্পাদনকারী। যেমন বলা হয়: মাথা ও দুই হাত মানুষের অংশ; আর এটা পরিজ্ঞাত যে, মাথা ব্যতীত ব্যক্তি মানুষ থেকে খারিয হয়ে যায়, কিন্তু কর্তিত হাতের কারণে তা হয় না।

---

(১) ইমাম নববী, আবু যাকারিয়া মহীউদ্দীন ইবনে শরফ (মৃ: ৬৭৬ হিঃ), *আল-মিনহায শরহু সহীহিল মুসলিম,* (বৈরুত: দারু ইহইয়ায়ে তুরাসিল ইসলামী, ১৩৯২ হি.), ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১৫০।

অনুরূপভাবে নামাযের তাসবীহ ও তাকবীরের ক্ষেত্রেও বলা হয় (এগুলো নামাযের অংশ), যদিও এগুলো না আদায়ের কারণে নামায বাতিল হয় না"। (১) সুতরাং মুখের স্বীকৃতি ও আমলকে পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম ঈমানের প্রবৃদ্ধি ও পূর্ণতা দানের অর্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এ অর্থে না যে এ দুটি ঈমানের মৌলিক অংশ অথবা তার কোন রোকন।

পূর্ববর্তী ইমামদের মধ্যে এ মাসয়ালার স্বরূপ নিয়ে চমৎকার তাহকীক করেছেন বিশিষ্ট ইমাম ও মুফাসসির আল্লামা নাসির উদ্দিন বায়যাবী (রহ.); যেমন তিনি হাদীসে জিবরাঈল [যে হাদীসে ঈমানের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: ঈমান হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, তার ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূল, শেষ দিবস এবং তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা] এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "এটা সুস্পষ্ট যে, আমল ঈমানের মৌলিকত্বের বহির্ভূত বিষয় এবং ইসলাম ও ঈমান দুটি ভিন্ন মর্মার্থের বিষয়, যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী অবগত করে:

﴿ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا ﴿١٤﴾ ﴾ [سورة الحجرات:١٤]

"বলুন: তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি"।

আর এ মতই অবলম্বন করেছেন ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী (রহ.)। আর কিছু মুহাদ্দিস এবং অধিকাংশ মু'তাযিলারা বলেন: ঈমান ও ইসলাম এক মর্মার্থের দুইটি ব্যক্তরূপ; আর এটা অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং কর্মে প্রতিপালনের সমষ্টি। তবে তাদের প্রত্যুত্তরে বলা হয়: আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য জায়গায় সৎকর্ম ও পাপ থেকে বিরত থাকাকে ঈমানের সাথে আত্ফ করেছেন (২)। এখন যদি আমল ঈমানের মৌলিকত্বের অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে এরূপ সমিচীন হতো না। (৩)

---

(১) গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তুসী, (মৃ: ৫০৫ হি:), *কাওয়ায়েদুল আকায়েদ,* (লেবানন, আলামুল কুতুব, ১৯৮৫ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, তাহকীক: মুসা আলী, পৃ. ২৫৯।

(২) "আত্ফ" ইলমে নাহুর একটি পরিভাষা। [অনুবাদক]

(৩) কেননা আতফের মূলনীতিই হলো মাতুফ ও মাতুফ আলাইহির মাঝে তাগাউর বা বৈপরিত্য থাকা। [অনুবাদক]

আর বিশেষভাবে মুহাদ্দিসগণের প্রত্যুত্তরে বলি, যদি আমল ঈমানের মৌলিক অংশই হতো তাহলে ফাসেক তার পাপাচারিতার কারণে মুমিনদের তালিকা বহির্ভূত হয়ে যেত; যেরকম মু'তাযিলারা বলেন। অথচ তারাই মু'তাযিলাদের এ মতকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।(১)

মুখে স্বীকৃতি ও কর্মের সাথে ঈমানের সম্পৃক্ততা

আর যখন ঈমানের মূল হলো, বশ্যতা ও আত্মসমর্পণের সাথে সাথে অন্তরে বিশ্বাস তখন শাহাদাতাইন [অর্থাৎ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ও أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ] বস্তুত মুমিন হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালা ও সাইয়েদুনা মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের দিকনির্দেশ করে। কাজেই এ সাক্ষ্য দুটো ঈমানের বাহ্যিক অভিপ্রকাশ এবং একজন মুমিনকে অপর থেকে আলাদা করার অনন্য হাতিয়ার। কিন্তু শুধুমাত্র মুখে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা ঈমানের মৌলিক অংশ না বরং তা ইসলামী শরীয়তের প্রতি আনুগত্য ও দৃঢ়বিশ্বাসের প্রতিক। কেননা কখনো এমন হয়ে থাকে যে, কোন ব্যক্তি যেকোন ওজরের কারণে মুখে সাক্ষ্য দিতে পারে না, এতদাসত্ত্বেও সে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল ﷺ এর প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে।

আর নানা ফরয, ওয়াজিব ও অন্যান্য নেক আমল, যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত; এছাড়াও অন্যান্য নফল ইবাদত যেমন সদাকাহ, অনুদান ইত্যাদি সবই ঈমানের প্রতি অবিচলতা ও পরিপূর্ণতার আলামত। এগুলো যতই বৃদ্ধি পায় ঈমানের শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। আর এটা এজন্য যে, তা ঈমানকে বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করে এবং করে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। আর এসকল আমলের কমতিতে ঈমানেরও কমতি ঘটে। তবে ব্যক্তি যতক্ষণ আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং নবী কারীম ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তন্মধ্যে দ্বীনের জরুরী বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ততক্ষণ তার ঈমানের মৌলিকত্ব দূর হয় না।

---

(১) নাসির উদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল-বাইদাবী (মৃ:৬৮৫ হি.), *তুহফাতুল আবরার শরহ মাসাবিহুস সুন্নাহ,* (কুয়েতঃ উযারাতুল আওকাফ ওয়া শুয়ুনিল ইসলামিয়া, ১৪৩৩ হি.), খ.১, পৃ. ৩০।

আর দ্বীনের জরুরী জ্ঞাত বিষয় সেগুলো যেগুলো দ্বীনের অংশ বলে আলেম ও সাধারণ শ্রেণি সবার কাছে সমভাবে প্রসিদ্ধ।

সুতরাং মুখের স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্ম মূলত মুমিনের অন্তরের ঈমানী বিশ্বাসকে ব্যক্ত করে।

কাজেই আমল প্রকৃতপক্ষে ঈমানের পরিপূর্ণতা ও শক্তির পরিচায়ক। কখনো কখনো এমন হয়, ব্যক্তি স্বীকৃতি কিংবা আমল করতে অক্ষম অথচ তার অন্তর সত্যায়ন, ইয়াকীন ও ঈমানে পরিপূর্ণ। আর এ বিষয়টির দিকেই নির্দেশ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَٔابٍ ٢٩﴾ [سورة الرعد:٢٩]

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল"।

এখানে লক্ষ করুন, কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদেরকে প্রথমে ঈমান এবং দ্বিতীয়তে নেক আমলে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া নিয়ে সম্বোধন করেছেন। এটি বস্তুত 'ঈমান ও তাসদীকের পরেই আমলের অবস্থান' এটাই নির্দেশ করে।

ঈমানের (শক্তি) বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে আনুগত্য বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণে:

ঈমানের ব্যাখ্যা এবং তার মাঝে মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলের সম্পূরক সম্পর্কের যে বিশ্লেষণ আমরা উল্লেখ করেছি এর উপর ভিত্তি করে জানা উচিত, ঈমানের শক্তি আনুগত্যের প্রাবল্যে বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার কারণে হ্রাস ঘটে।

আর "আনুগত্য" মানে: আদিষ্ট কাজ করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। আর "অবাধ্যতা" মানে: আল্লাহ তায়ালার আদেশের অমান্যতা করা।

তবে এখানে লক্ষ রাখতে হবে, পূর্বে উল্লেখিত ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের কথা বস্তুত 'ঈমানের মৌলিকত্ব হলো অন্তরে বিশ্বাস' এ কথার উপর

ভিত্তি করে বলা হয়েছে। আর কথার স্বীকৃতি এবং কাজে প্রতিফলন ঈমানের পরিপূর্ণতা দানকারী ও সম্পাদনকারী। কাজেই মুমিনের আমলের অবস্থা কমতি বা হ্রাস যাই হোক না কেন, সে মৌলিকভাবে মুমিনই। কোন কবিরা গুনাহ কিংবা আমলে ত্রুটির কারণে ইসলাম থেকে খারিয হবে না।

আর ঈমান যে বৃদ্ধি পায় এর দলীল হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীসমূহ:

﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾﴾ [سورة آل عمران:١٧٣]

"যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী"।

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾﴾ [سورة الأنفال:٢]

"আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে"।

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾﴾ [سورة التوبة:١٢٤]

"অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে"।

আর যখন ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তারমানে সেটা হ্রাসেরও সম্ভাবনা রাখে। (১)

---

(১) **উল্লেখ্য, আমাদের মাতুরিদী ধারা অনুসারে,** ঈমান মূলত বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না। ইমান হলো তাসদীক- অর্থাৎ, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস (তাসদীক বিল-জানান)। তাই কারো ঈমান থাকলে সেটি সম্পূর্ণ থাকে, এবং

এ গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার ইতি টানার প্রাক্কালে তিনটি বিষয়ের উপর সর্তকতা জরুরী:

প্রথমত: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট ঈমানের তাৎপর্য অন্তরে বিশ্বাসে বা (তাসদীক) হওয়াটা আমল ও মুখে কালিমায়ে শাহাদাতের স্বীকৃতিকে ঈমানের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার আবশ্যকতাকে নাকচ করে না। তবে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, এগুলো কি ঈমানের এমন মৌলিক অংশ, যদি কারো না থাকে তাহলে মুমিন কাফেরে পরিণত হবে, নাকি এগুলো ঈমানের এমন পূর্ণদানকারী যার মাধ্যমে মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে? পূর্ববর্তী বর্ণনা অনুযায়ী এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হলো, এগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সুপ্রতিষ্ঠিত মত অনুযায়ী ঈমানের পরিপূর্ণতার উপাদান, মৌলিক অংশ নয়।

দ্বিতীয়ত: আমরা এটা অস্বীকার করিনা যে, আমল দ্বীনের আবশ্যিক কর্তব্য বিষয়। বরং এগুলো আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ফরযী বিষয়। আর যে ব্যক্তি এগুলো ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ করবে ও তওবা করবে না সে পাপী এবং কিয়ামত দিবসে শাস্তির উপযুক্ত হবে। কিন্তু এগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন ব্যতীত আমল ত্যাগ ব্যক্তিকে কুফুরীর দরজায় পৌঁছাবে না। বরং সে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন পাপী মুমিন হিসেবেই বিদ্যমান থাকবে এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান থেকে মুক্তি পাবে।

ইমানের মধ্যে মূল অংশে বাড়া-কমার বিষয় নেই। তবে, তারা এ-ও বলেন যে- ঈমানের আলামত বা ফলাফল (যেমন আমল, খুশু, তাকওয়া) এগুলো বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। কেউ অধিক আমল করলে তার ঈমানের প্রকাশ বা প্রভাব বাড়তে পারে, কিন্তু ঈমানের মূল বা হাকীকত কমে বা বাড়ে না। মোটকথা, তারা ঈমানের মৌলিকত্বের দিকে লক্ষ করে ইমানের বৃদ্ধি ও হ্রাসের বিষয়টি নাকচ করেছেন। আর উপরে যারা ইমান বৃদ্ধি বা হ্রাসের কথা বলেছেন তারা আমলের দিকে লক্ষ করে বলেছেন; ঈমানের মৌলিকত্বের দিকে লক্ষ করে নয়। ফলে দেখা যায় মূল তত্ত্বে তারা উভয়ে এক; দৃষ্টিকোন এবং উপস্থাপনে ভিন্নতা। হ্যাঁ সালাফী-আহলে হাদীসরা যখন ঈমান বৃদ্ধির কথা বলে তারা সাধারণত মৌলকত্বে বৃদ্ধি উদ্দেশ্য নেয়; এক্ষেত্রে তাদের সাথে আমাদের মাতুরিদীদের ইখতিলাফ মৌলিক ও যৌক্তিক। [অনুবাদক]।

তৃতীয়তঃ একপাশে মুরজিয়াদের মত, আর অপর পাশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আশয়ারী, মাতুরিদী ও তাদের অনুগামীদের মাঝে চরম পার্থক্য। ঐ সকল মুরজিয়াদের মতের সারকথা হলোঃ তারা বিশ্বাস করে, পাপ মুমিনের কোন অনিষ্ট করবে না, আর পাপীদের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে যে শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে এটা শুধুমাত্র কাফেরদের জন্য। আর কিয়ামত দিবসে পাপী মুমিনদের অবস্থা অনুগত মুমিনদের মতোই হবে![১] আর তাদেরকে 'মুরজিয়া' নামে নামকরণ করা হয়, কেননা তারা সার্বিকভাবে ঈমানের তাৎপর্য থেকে পাপের কালো প্রভাবকে দূরে ঠেলে দেয়; এবং তারা দাবী করে, মুমিনের মাঝে (দুনিয়া ও আখিরাতে) পাপ নাকি কোন কালো প্রভাব ফেলে না।

এর মাধ্যমে আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ইতি টানলাম যা আকিদার মৌলিক তিনটি অধ্যায়ঃ ইলাহিয়্যাত, নবুওয়্যাত এবং সাময়িয়্যাতের [২] বর্ণনা আরম্ভের প্রারম্ভে বর্ণনা করা আবশ্যক ছিলো।

---

(১) আমরা বলি, কবিরা গুনাহকারী পাপী ব্যক্তি যদি তাওবা ব্যতীত মারা যায় তাহলে তারা পুরোপুরি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এবং হুকুমের আওতাধীন। চাইলে তিনি বিশেষ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾ [سورة النساء:٤٨].

আবার চাইলে তিনি তার আদালাত প্রদর্শনস্বরূপ তাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। শাস্তি প্রাপ্তির পর তিনি তার রহমতগুণে এবং নবী-আম্বিয়া ও তার প্রিয় বান্দাদের সুপারিশে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। অতঃপর একজন মুমিনের মৌলিক যেই স্থান অর্থাৎ জান্নাতে প্রেরণ করবেন। [অনুবাদক]।

(২) ইলাহিয়্যাত অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালা, নবুওয়্যাত অধ্যায়ে নবী ও রাসূল এবং সাময়িয়্যাত অধ্যায়ে কবরের আযাব, পুনরুত্থান, মিযান, হাশর, পুলসিরাত সম্পর্কিত বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়। [অনুবাদক]।

প্রথম অধ্যায়
ইলাহিয়্যাত (আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কিত বিশ্বাস)

ইলাহিয়্যাত নামে আমাদের আলোচ্য বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ঐ সকল আকিদা সম্পর্কিত মাসয়ালা-মাসায়েল যেগুলো আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পরিচয় লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন: আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও গুণাবলিকে দলীলভিত্তিক প্রতিপন্ন করা।

পাশাপাশি এ অধ্যায়ে আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক সিফাতের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করবো। অনুরূপভাবে এখানে আমরা আল্লাহ তায়ালার শানে কি কি প্রযোজ্য নয় তা নিয়ে কথা বলবো। অতঃপর আমরা তার কর্ম নিয়েও আলোচনা করবো। যার বিস্তারিত বয়ান সামনেই আসছে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম সানুসী (রহ:)[১] এই অধ্যায়কে এমন অভিনব পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছেন যাকে আকিদার উলামায়ে কেরাম একবাক্যে অনুমোদন দিয়েছেন।

তিনি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত মাসয়ালাগুলোকে তিনটি সংক্ষিপ্ত ধারায় উপস্থাপন করেছেন:

প্রথম (وَاجِبات): আল্লাহর জন্য আবশ্যিক বিষয়াবলি প্রতিপন্নকরণ, আর সেগুলো হলো সিফাতুল কামাল (সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত গুণাবলি)।

---

(১) তিনি হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ওমর আস-সানুসী আল-মালেকী আল-আশয়ারী রহ. (মৃ. ৮৯৫ হি.)। তিনি অনেক উঁচু তবকার সূফি ছিলেন। তিনি তার সময়ের অন্যতম সেরা আকিদা বিশারদ ছিলেন। আকিদা, ফিকহ, উসূল ও তাসাউফে তার বহু কিতাব বিদ্যমান। [অনুবাদক]

দ্বিতীয় (مُسْتَحِيلات): আল্লাহ তায়ালার শানে অপ্রযোজ্য বিষয়াবলিকে নাকচকরণ, আর সেগুলো হলো সিফাতুন নাক্চ (ত্রুটি নির্দেশক বৈশিষ্ট্য)।

তৃতীয় (جائِزات) : আল্লাহ তায়ালার শানে প্রযোজ্য বিষয়াবলি অবগত হওয়া।

আল্লাহ তায়ালার শানে অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি

সামাগ্রিকভাবে সমস্ত ত্রুটিমুক্ত গুণাবলিই আল্লাহ তায়ালার সিফাত। চাই ঐ সমস্ত সিফাত আমরা জানি অথবা না জানি। বস্তুত সেগুলো কোন সীমা বা পরিসংখ্যানের অধীন না। সুতরাং আমরা ঐ সমস্ত সিফাতে সামগ্রিকভাবে ঈমান আনি। তবে আল্লাহ তায়ালা তার অসীম সিফাতগুলোকে সবিস্তারে অবগত হয়ে ঈমান আনার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করেন নি। হ্যাঁ যেসকল সিফাতের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তিগত দলীল বিদ্যমান সেগুলো তো সবিস্তারে জানতেই হবে। আর আল্লাহ তায়ালা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এরকম সিফাত সর্বমোট তেরটি:(১)

১. الوُجُود (অস্তিত্ব)	৮. الإرَادَة (ইচ্ছা)
২. القِدَم (অনাদিত্ব)	৯. القُدْرَةُ (সক্ষমতা)
৩. البقاء (অনন্ততা)	১০. الحياة (হায়াত)
৪. مخالفة للمخلوقات (সৃষ্টির বৈপরীত্য)	১১. السَمْع (শ্রবণ)
৫. القيام بنفسه (স্বনির্ভরশীলতা)	১২. البَصَر (দৃষ্টি)
৬. الوحدانية (একত্বতা)	১৩. الكَلام (কথা)
৭. العِلْمُ (জ্ঞান)	

(১) মাতুরিদীদের নিকট সর্বমোট ১৪ টি। তাদের নিকট অতিরিক্ত আরেকটি হলো, التَكْوِيْن (ইচ্ছা ও কুদরতের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে অস্তিত্ব দান)। [অনুবাদক]

আবার পাশাপাশি বিশ্বাস রাখতে হবে, উপরোক্ত সিফাতের বিপরীতগুলো আল্লাহ তায়ালার শানে অসম্ভব এবং অপ্রযোজ্য। কাজেই আল্লাহ তায়ালা অনস্তিত্বশীল নন, তিনি নশ্বর নন, তিনি নিঃশেষযোগ্য নন, সৃষ্টির কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্যময় নন, সৃষ্টবস্তুর কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, একাধিক নন, কোন কিছুর ব্যাপারে অজ্ঞ নন, তিনি অক্ষম কিংবা সসীম ইচ্ছা ও সসীম ক্ষমতার অধিকারী নন, বধীর, দৃষ্টিহীন বা কালাম করতে অক্ষম নন।

আর আল্লাহ তায়ালার কর্মাবলির ক্ষেত্রে একজন মুমিনকে বিশ্বাস করতে হবে: সমস্ত কর্মাবলি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই, এবং সেটা তার ক্ষমতাবলে এবং একান্ত ইচ্ছায়। চাইলে তিনি করতে পারেন আবার চাইলে পরিত্যাগ করতে পারেন। কোন কাজই তার উপর করা আবশ্যক নয়। তিনি হলেন এ সৃষ্টিজগতের কর্তৃত্বশালী, একচ্ছত্র অধিপতি।

আর কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত সমস্ত সিফাত; যেগুলোর তাৎপর্য বস্তুত উল্লেখিত সিফাতেরই ভাবজ্ঞাপক সেগুলোতেও আমরা ঈমান রাখি। এই যেমন: আল্লাহ তায়ালা এমন রহীম যিনি সৃষ্টিজীবের প্রতি রহমতের ইচ্ছা করেন। আবার তিনি অমুখাপেক্ষী (الغنيُّ), অর্থাৎ তিনি কোন কিছুর প্রয়োজন বোধ করেন না। আবার তিনি বেষ্টনকারী (المُحِيطُ) অর্থাৎ সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্বশালী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [سورة الصافات: ١٨٠].

"পবিত্র আপনার পরওয়ারদিগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে থাকে তা থেকে"।

আল্লাহ তায়ালার শানে আবশ্যিক গুণাবলির প্রকারভেদ

যেসকল গুণাবলি আল্লাহ তায়ালার জন্য সাব্যস্ত করা আবশ্যক সে সকল গুণাবলিকে আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামাগণ তিনভাগে ভাগ করেছেন। তবে তার আগে জেনে রাখা আবশ্যক, মৌলিকভাবে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি অংশে অংশে ভাগ (বিভাজন) বা প্রকরণে বিন্যস্ত করার

বিষয় নয়। কেননা বিভাজন বা প্রকরণে বিন্যস্ত হওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে অসম্ভব। কাজেই আমরা নিম্নে যে প্রকরণ উল্লেখ করবো তা শুধুমাত্র পাঠদান ও বুঝার জন্য, যাতে করে সহজে বিষয়গুলো মুখস্থ রাখা যায় এবং পরিচয় লাভ করা যায়। আর ঐ তিন প্রকার হলো:

১. সিফাতুন নাফসিয়্যাহ (সত্তাগত গুণ)।
২. সিফাতুস সালবিয়্যাহ (নাকচবোধক গুণাবলি)।
৩. সিফাতুল মা'আনী (অর্থজ্ঞাপক গুণাবলি)।

প্রথম প্রকার: সিফাতুন নাফসিয়্যাহ (সত্তাগত গুণ)

- **الوُجُود (অস্তিত্বতা):**

সত্তাগত গুণ হলো "الوُجُود অস্তিত্বতা বা বিদ্যমানতা"। আর এ সিফাতকে সত্তাগত (বা নাফসিয়্যাহ) নামে নামকরণ করা হয় কেননা এটা আল্লাহ তায়ালাকে অস্তিত্বমান সত্তা হিসেবে ব্যক্ত করে।

আর এ সিফাতের উপর বিশ্বাস রাখার মর্মকথা হলো: আমাদের এ বিশ্বাস রাখা, আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান আছেন। এবং এ কথা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত। কেননা এটা অসম্ভব যে, সপ্তাকাশ, অগণিত মাখলুকাত, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত বিশিষ্ট এই মহাজগত কোন অস্তিত্বশীল সৃষ্টিকর্তা যিনি এ মহাজগত অস্তিত্ব দান করবেন তিনি ব্যতীত বিদ্যমান থাকবে। কাজেই এটা বোধগম্য নয় যে, এ মহাজগত নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে অথবা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, সুনিপুণ ও শৈল্পিক সুদৃঢ়তার গুণবিশিষ্ট সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই হঠাৎ অস্তিত্বে এসেছে।(১)

---

(১) আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾﴾ [سورة الزمر: ٦٢]

দ্বিতীয় প্রকার: সিফাতুস সালবিয়্যাহ (নাকচবোধক গুণাবলি)

আর এসকল সিফাতকে সিফাতুস সালবিয়্যাহ (বা নাকচবোধক গুণাবলি) বলা হয় কেননা এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শানে অপ্রযোজ্য সমস্ত ত্রুটিকে নাকচ করে দেয়। আর এগুলো সর্বমোট পাঁচটি:

ক. "القِدمُ (আদিত্ব)": এর মর্মকথা হলো আল্লাহ তায়ালার বিদ্যমানতার কোন শুরু নেই। ভিন্ন আঙ্গিকে বললে: আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বপূর্ব অনস্তিত্বতার সম্ভাবনাকে নাকচ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ﴾ [سورة الحديد:٣]. (১)

"তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ"

খ. "البَقَاء (অনন্ত)": এর মর্মকথা হলো, আল্লাহ তায়ালার বিদ্যমানতার কোন শেষ নেই। ভিন্ন আঙ্গিকে বললে: আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব পরবর্তী অনস্তিত্বতার সম্ভাবনাকে নাকচ করা।(২)

গ. "القِيامُ بالنَّفْس (স্বনির্ভরতা)": এর মর্মকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্ট বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি এ সৃষ্টিকুলের কারো প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। অন্যভাষায় বলতে গেলে: এ সৃষ্টিজগতসমূহের কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা তার নেই। সুতরাং তিনি কোন

---

(১) أيْ ليس لوجوده بداية، ولا لبقائه نهاية "অর্থাৎ, তার অস্তিত্বের কোন শুরু নেই, আবার তার বিদ্যমানতার কোন শেষ নেই"। দেখুন: মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *সফওয়াতুত তাফাসীর*, (কায়রো: দারুস সাবুনী, ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, খ.৩, পৃ.৩০২। [অনুবাদক]

(২) আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ٢٦ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧﴾ [سورة الرحمن:٢٦-٢٧].

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।" [অনুবাদক]

গুণ বা সৃষ্টবস্তু নন [১] । আবার তিনি কোন স্থান বা পাত্রের মুখাপেক্ষী নন অথবা কোন সহযোগী বা সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষীও নন।[২] আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥﴾ [سورة فاطر:١٥].

"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত"।

ঘ. "مخالفته تعالى للمخلوقات (সৃষ্ট বস্তুর বৈপরিত্য)": এর মানে হলো: আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট বস্তুর কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য রাখেন না। বরং তিনি তার সত্তায়, গুণাবলি এবং কর্মাবলি সকল ক্ষেত্রে সৃষ্ট বস্তু থেকে অনন্য। যেমন: এ পৃথিবী তার সমস্ত বস্তু সহকারে হাদেস বা নশ্বর। আর সকল নশ্বর বস্তুই সৃষ্ট, তো আল্লাহ তায়ালা সৃষ্ট নন। পৃথিবী এবং তার সমস্ত বস্তু পদার্থ (جِسْم) এবং অপর নির্ভর গুণের (عَرَض) সমষ্টি; সুতরাং তিনি কোন জিসিম বা আপেক্ষিক গুণধারী নন। সেগুলো স্থান দখল করে ও যৌগিক; তো আল্লাহ তায়ালা স্থানের উর্ধ্বে এবং যৌগিক নন। বরং বান্দার জন্য এ বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে, তার একজন প্রভু ও মহান সৃষ্টিকর্তা আছেন, কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়।

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

---

(১) কেননা গুণ বা সিফাত মাওসুফ বা গুণান্বিত বস্তুর মুখাপেক্ষী আর মাখলুক বা সৃষ্টবস্তু খালিকের মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তায়ালা কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী না। সুতরাং তিনি কোন সিফাত বা মাখলুক নন। [অনুবাদক]

(২) সুতরাং কেউ যদি বিশ্বাস করে আল্লাহ কোন কিছুর ভিতরে আছেন সে উম্মতের ঐক্যমতে কাফের। অনুরূপভাবে যারা হুলুল ইত্তেহাদের আকিদা পোষণ করে তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা। *উম্মুল বারাহিন*, পৃ. ৩৯। [অনুবাদক]

ঙ. الوَحْدانِيَّة (এককত্ব) :

এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ তায়ালা তার সত্তায়, গুণে ও কার্যাবলিতে এক ও অনন্য। সুতরাং তার কোন সমকক্ষ ও অংশীদার নেই। সৃষ্টিজগতের কারো এমন গুণ নেই যা তার গুণের ন্যায়। কাজেই তিনি হলেন তার ক্ষমতাবলে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধিকারী। তার যেসকল গুণাবলি রয়েছে তার কোন উপমা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤﴾ [سورة الإخلاص: ١-٤].

অর্থ: "বলুন তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউই নাই।"

আর কর্মাবলির কার্যকরণ, সৃষ্টি এবং অস্তিত্বে আনয়ন সবই শুধু আল্লাহরই। কর্মে, পরিচালনায় এবং সৃষ্টিকরণে আল্লাহর সাথে কেউই কর্তৃত্ব রাখে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ۝٦٢﴾ [سورة الزمر: ٦٢].

অর্থ: "আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক"।

তৃতীয় প্রকার: সিফাতুল মা'আনী (অর্থজ্ঞাপক গুণাবলি):

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সত্তায় প্রতিষ্ঠিত অনাদি গুণাবলি। এগুলো সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলির সাথে সাদৃশ্য রাখে না। তাছাড়া এগুলো এরকমও নয় যে সময়ের পরিবর্তনে এগুলোও পরির্তন হবে। বরং আল্লাহ তায়ালার সত্তার ন্যায় এগুলোও কাদিম বা অনাদি।

১. **"الحَيَاة। (হায়াত)"**: এর মর্মকথা হলো আল্লাহ তায়ালা এমন চিরস্থায়ী হায়াতে বিশেষায়িত যার উপর মৃত্যু ও নশ্বরতা আপতিত হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾

অর্থ: "আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।"

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [سورة البقرة:٢٥٥]

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক"।

এ সিফাতের আরো একটি তাৎপর্য হলো, তিনি জড়বস্তুর ন্যায় কোন জড়বস্তু নন, যেরকম পাথর, মূর্তি আর তারকাপূজারীরা দাবি করে। আর এজন্যই সমস্ত অস্তিত্বমান জিনিসের মাঝে তিনিই একমাত্র ইবাদত প্রাপ্তির হকদার। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [سورة غافر:٦٥]

অর্থ: "তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি ইবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর"।

২. **"العِلْم। (জ্ঞান)"**: এর তাৎপর্য হলো, যা অস্তিত্বে এসেছিল, যা অস্তিত্বে বিদ্যমান এবং যা অস্তিত্বে আসবে সমস্ত কিছু সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত। কাজেই প্রত্যেক ঐ জিনিস যা বিদ্যমান সবই আল্লাহর জ্ঞানের অধীন। অস্তিত্বের মাঝে এমন কিছু নাই যা আল্লাহ তায়ালার ইলমে বিদ্যমান নাই। যদি এমন হতো তাহলে মূর্খতা আবশ্যক হতো, অথচ তিনি মূর্খতা থেকে পূত-পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾﴾ [سورة طه:٩٨]

অর্থ: তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

আর মূর্খতা মাখলুকের এমন গুণ যেখানে সে কোন কিছুর ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾﴾ [سورة المؤمنون:٩٢]

অর্থ: "তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে ঊর্ধ্বে"।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾﴾ [سورة سبأ:٣]

অর্থ: "কাফেররা বলে আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ- অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে তাঁর আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ। সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে"।

কাজেই প্রত্যেক বান্দাকে তার চলন-বলন ও কর্মাবলির উপর অতীব গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। যার ফলে সে এগুলোকে শরীয়তের আলোকে করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত কিছু সম্পর্কে অবগত।

৩."الإرادة (ইচ্ছা)": আর এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছার কার্যবিধানকারী, যা চান তা'ই হুকুম দেন। তার হুকুম বা ফয়সালার প্রতিহতকারী কেউ নেই। কাজেই অস্তিত্বে যাই আসে সবই তার ইচ্ছায় এবং পছন্দে। ফলে আল্লাহ তায়ালা কোন বস্তুর জন্য যে গঠন, বৈশিষ্ট্য, ধরন এবং হালত পছন্দ করেন সে অনুযায়ী ব্যতীত কোন কিছুই হবে না।

আল্লাহ তায়ালা যেটা চান না সেটা কস্মিনকালেও হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾﴾ [سورة البروج:١٦]

অর্থ: "তিনি যা চান, তাই করেন"।

তিনি আরো বলেন:

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾﴾ [سورة البقرة:٢٥٣]

অর্থ: "কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন"।

আবার অন্যস্থানে তিনি বলেন:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدٗا ﴿٢٤﴾﴾ [سورة الكهف:٢٣-٢٤]

অর্থ: "আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামীকাল করব। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে। আর কখনও ভুলে গেলে নিজ প্রতিপালককে স্মরণ করুন এবং বলুন, আমি আশা করি আমার প্রতিপালক এমন কোন বিষয়ের প্রতি আমাকে পথনির্দেশ করবেন, যা এর চেয়েও হিদায়াতের বেশি নিকটবর্তী হবে"।

৪."القُدْرة (ক্ষমতা)": এর তাৎপর্য হলো, সমস্ত কিছুই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। আর তিনিই এগুলোর স্রষ্টা, এবং অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দানকারী। এগুলো অস্তিত্বদান এবং সৃষ্টিকরণে অন্য কারো বিন্দু পরিমাণ ক্ষমতা ও প্রভাব নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿٢٠﴾﴾ [سورة البقرة:٢٠]

অর্থ: "আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল।"

আবার আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾﴾ [سورة يس:٨١]

অর্থ: "যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ"।

অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾﴾ [سورة الكهف:٤٥]

অর্থ: "আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান"।

এ সিফাতের আরো তাৎপর্য হলো, মানুষ জাতি এবং অন্যান্য সৃষ্টিজগত যেমন ফেরেশতা, জিন কেউই কোন কিছু করার প্রকৃত ক্ষমতা রাখে না। তাদের কর্ম কোন কিছুতে মৌলিক প্রভাব ফেলতে পারে না। ফলে তারা কোন জিনিস সৃষ্টি করতে পারে না, রিযিক দিতে পারে না, জীবন দান করতে পারে না, মৃত্যু দিতে পারে না। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

﴿أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [سورة الواقعة:٥٨-٥٩]

অর্থ: "তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে। তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি"?

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾﴾ [سورة الواقعة:٧١-٧٢]

অর্থ: "তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি ?

তিনি আরো বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾﴾ [سورة فاطر:٣]

অর্থ: "হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (১)

৫. "الكلام (কালাম বা কথা)": এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তায়ালা এমন অনাদি গুণে গুণান্বিত যা আল্লাহ তায়ালার ইলমে বিদ্যমান বিষয়কে নির্দেশ করে। আর আল্লাহ তায়ালার কথা বা বাণী সৃষ্টিবস্তুর কথার মতো নয়। সেটা এমন অনাদী বাণী যা কোন বর্ণ কিংবা আওয়াজ দ্বারা গঠিত নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾ [سورة النساء:١٦٤]

অর্থ: আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন ই করেছেন।

৬. "السمع (শ্রবন)": এর মানে হলো, আল্লাহ তায়ালা এমন অনাদি গুণে গুণান্বিত যা শ্রুতিমূলক বিষয় অনুধাবনের সাথে সম্পৃক্ত। আর

---

(১) এখানে আরো একটি সিফাত উল্লেখযোগ্য, সেটা হলো:

"التكوين (অস্তিত্বতা দান)": এর তাৎপর্য হলো, অস্তিত্বের উপযোগীতা থেকে কার্যকরীভাবে অস্তিত্বে রূপদান।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾ [سورة يس:٨٢].

অর্থ: "তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।"

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বিশেষ করে মাতুরিদীগণ আল্লাহ তায়ালার তাকউইন সিফাতের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট ফায়েদা:

ক. বিশুদ্ধ মতে, সমস্ত সিফাতে আফআল বা কর্মগত গুণাবলি যেমন: "الإحياء (জীবিতকরণ)", "الإماتة (মৃত্যুদান)", "الترزيق (রিজিকপ্রদান)" ইত্যাদি এই সিফাতে তাকউইন এর অন্তর্ভুক্ত।

খ. আর আশয়ারীগণ স্বতন্ত্রভাবে তাকউইন সিফাতের প্রবক্তা নন। বরং তারা তাকউইন সিফাতের মর্মকথাকে সিফাতুল কুদরাত এর মধ্যেই শামিল করেন। [অনুবাদক]

আল্লাহ তায়ালার শ্রুতি এমন অনাদিগুণ যা সৃষ্টবস্তুর শ্রুতির সাথে সাদৃশ্য রাখে না। ফলে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত কিছু শ্রবণকারী গুণান্বিত হওয়ার জন্য কানের প্রয়োজন হয় না। বরং এগুলো হচ্ছে সৃষ্ট বস্তুর শ্রুতিশক্তির অঙ্গ । আর আল্লাহ তায়ালা সব রকম উপকরণ, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং উপাদানের প্রয়োজনীয়তা থেকে পবিত্র।

৭. "البَصَر (দৃষ্টি)": এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তায়ালা এমন গুণে গুণান্বিত যার মাধ্যমে সমস্ত দর্শনযোগ্য জিনিসের অনুধাবন হয়। আর আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি এমন অনাদি দৃষ্টি যা সৃষ্টি বস্তুর সাথে কোন প্রকারের সাদৃশ্য রাখে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [سورة الشورى:١١]

অর্থ: "কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।"

আর আল্লাহ তায়ালার সমস্ত কিছু দেখার জন্য চোখের তারা বা চোখের পাতার প্রয়োজন নেই। বরং তিনি তো এমন দৃষ্টির অধিকারী যে, চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় দেখেন ও লক্ষ্য রাখেন।

আল্লাহ তায়ালার সিফাত বস্তুত এমন কিছু তাৎপর্য ও বিষয়ের সমষ্টি যেগুলোকে আমরা আল্লাহ তায়ালার জন্য সাব্যস্ত করি। ফলশ্রুতিতে আমরা যেমন বলে থাকি: "আল্লাহ তায়ালা কুদরত তথা ক্ষমতার গুণে গুণান্বিত" অর্থাৎ আমরা কুদরতের তাৎপর্য আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারণ করি। আর সেটা হলো, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা করার ক্ষমতা থাকা। পাশাপাশি আমরা তার শানে অক্ষমতাকে নাকচ করি। আর সেটা হলো, ইচ্ছামত কাজ করতে না পারা। এভাবে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সকল সিফাতের ক্ষেত্রে একই কথা।

আল্লাহ তায়ালার সুন্দর নামসমূহ এবং সুমহান গুণাবলি না সীমাবদ্ধ, না আছে এর শেষঃ

আর এটা জানা কথা যে, আল্লাহ তায়ালার নাম এবং গুণাবলিসমূহ অতিসুন্দর, অতিমর্যাদাময় এবং ত্রুটিমুক্ত। আর এর কিছু আছে যা কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে; আর অনেক আছে বর্ণিত হয়নি। (না হওয়ারই কথা) কেননা আল্লাহ তায়ালার নাম, গুণাবলি এবং কামালিয়াতের না আছে কোন সীমা, না আছে কোন সংখ্যা।

আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত (তাওক্বিফী) :

ফিকহ এবং আকিদা-বিশারদগণ আল্লাহ তায়ালাকে কোন নামে নামকরণ করা এবং কোন গুণে গুণান্বিত করার বৈধতা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ফলে তারা আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলিকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত (তাওকিফী) বলে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ তায়ালার শানে বিভিন্ন নামের ব্যবহার ও সাব্যস্তকরণ শুধুমাত্র শরীয়তের অনুমতি সাপেক্ষে করব। আর এটা এভাবে যে, তাঁর নাম বা গুণাগুণের ব্যাপারে কুরআনে কারীম বা হাদীসে নববীতে বর্ণিত হবে। কাজেই কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়নি এমন নামে আল্লাহ তায়ালাকে নামকরণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে যায়েয নয়।

আর কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত হয়নি এমন কোন নির্দিষ্ট গুণে আল্লাহ তায়ালাকে গুণান্বিত করার ব্যাপারে উলামাদের বিশদ আলোচনা রয়েছে। তবে মানুষের জন্য অধিক উত্তম হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা ব্যতীত কোন গুণ আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার না করা। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে আমাদের এরকম শব্দ ব্যবহার করা জায়েয হবে না যেঃ তিনি পৃথিবীর প্রকৌশলী, নকশাকারী বা নির্মানকারী। কেননা এগুলো কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়নি এবং আল্লাহ তায়ালাও এর অনুমতি দেননি। তাছাড়া কখনো কখনো এগুলো তার শানে অবাঞ্চনীয় অর্থেরও অবকাশ দেয়।

দ্ব্যর্থবোধক (المُتَشَابِهَات) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত করাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতিঃ

কুরআনে কারীমে এবং সুন্নাতে নববীতে এমন কিছু বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে যেগুলো প্রাথমিক দৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টি বস্তুর সাথে সাদৃশ্যের অবকাশ দেয়। এ সকল বাণীগুলোকে "মুতাশাবিহাত" (বা **দ্ব্যর্থবোধক বাণী)** নামে নামকরণ করা হয়, কেননা এসকল নুসুস (বাণী) একজন মুমিনকে প্রাথমিক দৃষ্টিতেই ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়।

আর অপরদিকে রয়েছে "মুহকাম" বা দ্ব্যর্থহীন আয়াত, যেগুলোতে কোন অস্পষ্টতা নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ﴾ [سورة آل عمران:٧].

অর্থ:"তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট"।

মুতাশাবিহাত আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অবস্থান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার শানে অনুপোযুক্ত বিষয়গুলো থেকে পবিত্রকরণের নীতিকেই ব্যক্ত করে। ফলে তার থেকে সাদৃশ্য প্রতিপাদন নাকচ হয়ে যাওয়া আবশ্যক হবে এবং এ বিশ্বাস রাখাও আবশ্যক হবে যে, তিনি সৃষ্টির কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য রাখেন না।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [سورة الشورى:١١].

কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।

তাফউইদ ও তা'বীল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট গৃহীত দুটি পন্থাঃ

ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি, শরয়ীভাবে একজন মুকাল্লাফের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাকে এমন বাতিল অর্থবহতা থেকে পবিত্র রাখা যেগুলো কখনো কখনো মুতাশাবিহাত নুসুস (দ্ব্যর্থবোধক উদ্ধৃতি) থেকে ধারণা করা যেতে পারে। আর এ পবিত্রকরণ (তানযীহ) এমন ওয়াজিব বিষয় যার হুকুমদানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাঝে কোন মতভিন্নতা নেই। তবে তানযীহের আবশ্যকতা মেনে নেওয়ার পর মুতাশাবিহাত নুসুসের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে [এভাবে যে এগুলো বিশ্লেষণে গভীর মনোযোগী হওয়া, অর্থ নির্ধারণ করা বা তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা] তা নিয়ে সৌহার্দপূর্ণ ইখতিলাফ করেছেন।

তো তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ঐ সকল বিশ্লেষণ থেকে বিরত থেকেছেন এবং তাফউইদের (تفويض) পথকে বেছে নিয়েছেন।

আর কেউ কেউ শরীয়ত বর্ণিত দ্ব্যর্থহীন উদ্ধৃতিকে (নুসূসে মুহকামাহকে) মানদণ্ড ধরে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তো তারা তা'বীলের (تأويل) পথকে নির্বাচন করেছেন।

মোটকথা হলো, এ উভয় পদ্ধতিই গ্রহণীয়। সুতরাং যে এর কোন একটিকে গ্রহণ করলো তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। আর ঐকমত্যের বিষয়তো "তানযীহ" ই যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আর বিস্তারিতভাবে তাফউইদ এবং তা'বীল এর তাৎপর্য বলতে গেলেঃ

ক. তাফউইদ (تفويض) হলোঃ অকাট্যভাবে এ বিশ্বাস রাখা, নস থেকে আক্ষরিক দৃষ্টিতে যে সাদৃশ্যের অর্থ স্পষ্ট হয় তা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য নয় এবং এর প্রকৃত উদ্দিষ্ট অর্থ আল্লাহর কাছে সমর্পিত। অর্থাৎ, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য আমরা জানি না তবে এর মৌলিক অর্থ আছে বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু ঐ অর্থ আল্লাহ তায়ালার উপরই ন্যস্ত, সেই অর্থকে

আমরা নিজেরা নির্ধারণ করতে যাই না। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾﴾ [سورة الفتح:١٠].

অর্থ: "যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। **আল্লাহর ইয়াদ** তাদের ইয়াদের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে; অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন"।

তো তাফউইদকারী কুরআনের এ আয়াতে ইয়াদুল্লাহ (يَدُ الله) শব্দের ক্ষেত্রে বলবে, এটি কোনো অঙ্গ অর্থজ্ঞাপক নয়। অতঃপর এর উদ্দিষ্ট অর্থ আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করবে, ফলে তিনি বলবেন: (والله أعلم بمراده) অর্থাৎ, আল্লাহই এর উদ্দিষ্টের ব্যাপারে সম্যক অবগত। আর এটি পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অনেক উলামা এবং মুফাসসিরদের গৃহীত পন্থা।

খ. তা'বীল (تأويل) হলো: বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস থেকে যে সাদৃশ্যের অর্থ প্রকাশিত হয় সেটি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য নয় বলে বিশ্বাস করা। তবে একটি উদ্দিষ্ট অর্থকে সুসংহত করা হবে। তো কেমন যেন উদাহরণস্বরূপ ইয়াদ (يَد) এর অর্থের ক্ষেত্রে সে বলবে: এটি কোনো অঙ্গ অর্থজ্ঞাপক নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো: ক্ষমতা (القدرة) ও প্রাধান্য (الغلبة)।

তবে তাওয়ীলের জন্য দুটি শর্ত রয়েছে:

১. (আল্লাহর শানে) ভাষাগত আক্ষরিক অর্থ আরোপ করা অসম্ভব হওয়া।

২. যেই অর্থে তাওয়ীল করা হয় শব্দটি ভাষাগতভাবে সেই অর্থের সম্ভাবনা রাখা, যেটি গঠনগত অর্থের নিকটবর্তী, শরীয়তের মৌলিক মূলনীতির অনুকূল।

উপরোক্ত বিষয়ে আকিদার বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত ইসবাত (الإثبات) পরিভাষার তাৎপর্য

আর কিছু শরয়ী কিতাবসমূহে 'ইসবাত (الإثبات) বা সাব্যস্তকরণ' পরিভাষার যে ব্যবহার এসেছে এর দ্বারা যদি নসকে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেটা তাফউইদ বা তাওয়ীল কোনটাকেই নাকচ করে না। কেননা উভয় পদ্ধতিতেই নসের সাব্যস্ততা রয়েছে।

আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয় অর্থকে সাব্যস্ত করা তাহলে এতেও تفويض বা تأويل কে নাকচ করা লাগে না। কেননা তাফউইদকারী এবং তাওয়ীলকারী উভয়ই অর্থের বিদ্যমানতাকে সাব্যস্ত করেন। তবে তাফউইদকারী এটার অর্থ জানেন না এবং এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও করেন না। আর তাওয়ীলকারী এর অর্থ জানেন এবং এটাকে ভাষা, ভাষা ব্যক্ত করার ধরন, নানাবিধ ইঙ্গিত এবং শরয়ী দলীল অনুযায়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন।

তবে এখানে সতর্ক থাকা দরকার, কিছু সাদৃশ্যবাদীও "ইসবাত" শব্দটি ব্যবহার করে, কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টি বস্তুর সাথে সাদৃশ্য দেওয়া উদ্দেশ্য নেয়। ফলে সে ইয়াদ (يد)[১] শব্দের ক্ষেত্রে বলে: এটাকে ঐভাবেই সাব্যস্ত করি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সে মনে মনে দেহত্ব, সাদৃশ্যতা, অঙ্গ-প্রতঙ্গের কুধারণা করে আছে। তারা যেসকল কথা বলে আল্লাহ তার থেকে অনেক অনেক পূত-পবিত্র।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, এসকল মুতাশাবিহ শব্দ (দ্ব্যর্থবোধক শব্দ) নির্দিষ্ট গঠনকে কেন্দ্র করেই এসেছে, চাই সেটা কুরআনে কারীমের কোন নস

---

(১) ইয়াদ আরবী শব্দ, এর আক্ষরিক অর্থ হাত।

অথবা হাদীসে নববী শরীফের নস হোক। কাজেই কোন মুসলিম যদি ঐসকল নুসুসের গঠন, পটভূমি এবং উদ্দিষ্ট বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তাহলে তার চিন্তায় সাদৃশ্যতা অথবা দেহত্বের অর্থ উদয়ই হতে পারে না। যেমন নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে:

﴿وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَاۖ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ١٨﴾ [سورة الطور:٤٨].

অর্থ: "আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন"।

(তো এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে) কাফেরদের কষ্টপ্রদানে তীব্রতা, তাদের অস্বীকৃতি, অবাধ্যচারিতার বিপরীতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপত্তা প্রদান এবং তার অন্তরকে সুদৃঢ় করা। তো আমরা যখন এ নসের বর্ণনা প্রসঙ্গ বুঝতে পারলাম তখন আল্লাহ তায়ালার এ ﴿فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَاۖ﴾ কথা দ্বারা কি উদ্দেশ্য তাও বুঝতে পারলাম। আর এতে কারো মেধায় ই এ চিন্তা উদিত হলো না যে, আয়াতে কারীমা আল্লাহর জন্য চোখ সাব্যস্ত করে, অথবা এসকল চোখ হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ এর স্থান ও জায়গা (কেননা যদি শাব্দিক অর্থ করা হয় তাহলে হবে, নিশ্চয়ই আপনি আমার চোখে)। বরং সবল মস্তিষ্ক, সুস্থ চিন্তার একজন মুসলিমকে আমরা এভাবে পাবো যে, তিনি এজাতীয় অর্থকে ঘৃণা করেন এবং হওয়াটাও অসম্ভব মনে করেন।

(أَمِرُّوهَا كَمَا جَائَتْ- অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক কথাগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখেই অতিবাহিত হও) মর্মে পূর্বসুরী কিছু ইমাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা বিশুদ্ধ কথা এবং এতে কোন আপত্তি নেই। এ কথার তাৎপর্য হলো: আমাদের নুসুসে মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক উদ্ধৃতি) এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ত্যাগ করা। আর এটাই আমাদের পূর্বালোচ্য তাফউইদী পন্থা। তবে এটা হবে পরিপূর্ণ তানযীহকে সাব্যস্ত করে এবং তাশবীহকে নাকচ করেই; যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের কর্মের স্রষ্টা

আল্লাহ তায়ালার এবং তার একত্ববাদের প্রতি ঈমানই এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুর একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাসের দাবি করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٦٢﴾ [سورة الزمر: ٦٢].

অর্থ: "আল্লাহ সর্বকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর উত্তম তত্ত্বাবধায়ক"।

অতএব আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন গাছ, পাথর, মানুষ ইত্যাদির স্রষ্টা। শুধু তাই না তিনি মানুষের কর্মাবলি, তাদের নড়ন-চলন, এবং তাদের ভালো অথবা মন্দ সকল কাজের স্রষ্টা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦﴾

অর্থ: 'অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন'।

এখন কেউ বলতে পারে: আল্লাহ তায়ালাই যদি বান্দাদের কর্মের স্রষ্টা হন তাহলে কিয়ামতের দিন তাদের কীসের উপর হিসাব নেওয়া হবে? এর জবাব হলো, কিয়ামতের দিন বান্দার কর্মের ইখতিয়ার বা নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে হিসাব নেওয়া হবে।

বান্দা তার কর্ম নির্বাচনে স্বাধীন এবং এর উপরই জিজ্ঞাসিত হবে

বান্দা তার সমস্ত ইখতিয়ারকৃত কর্মাবলির উপর জিজ্ঞাসিত হবেন। সুতরাং সে তার পছন্দ এবং ইচ্ছায় যে কর্মই করবে তাই তার হিসাব এবং দায়ভারের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা মুকাল্লাফ ব্যক্তি যে কর্ম নির্বাচন করে তার উপর ভিত্তি করেই তাকলিফ (শরীয়ত অর্পিত কর্মভার) হয়ে থাকে। আর মুকাল্লাফ ব্যক্তির ইখতিয়ার (বা নির্বাচনতা) তার পুরস্কার বা শাস্তির সবব বা কারণ। ফলে মুকাল্লাফ ব্যক্তি যদি উত্তম কর্ম ইখতিয়ার করে তাহলে তার জন্য আজর বা প্রতিদান লিখা হয়, আর যদি হারাম কর্ম

ইখতিয়ার করে তাহলে তার জন্য পাপ লিখা হয়। অনুরূপভাবে সে যদি কোন আবশ্যিক কর্তব্য পরিত্যাগ করার ইখতিয়ার করে তাহলে এ ত্যাগের কারণে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ﴾ [سورة البقرة:٢٨٦].

অর্থ: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে"।

❁❁❁

ক্বদা (ফয়সালা) এবং ক্বদর (নিরূপণ) এর তাৎপর্য

ক্বদা বা ফয়সালা হচ্ছে, আযালী (বা চিরন্তনভাবে) কোন বিষয়ে যা ইচ্ছা করে রেখেছেন এবং যা আল্লাহ তায়ালা আযালী বা চিরন্তন জ্ঞানে বিদ্যমান। আর ক্বদা অবধারিত বিষয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾﴾ [سورة مريم:٢١].

অর্থ: "এটা তো এক স্থিরকৃত ব্যাপার"।

আর ক্বদর হলো, বিভিন্ন বস্তুকে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এবং ইলম অনুযায়ী বাস্তবে অস্তিত্ব দান করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر:٤٩].

অর্থ: "আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি"।

অতএব, তাক্বদীর হলো কোন জিনিসকে নির্ধারিত পরিকল্পনায় করা। যেমন বলা হয়: ইঞ্জিনিয়ার ঘরটির পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন, অর্থাৎ তিনি ঘরটির আকৃতির মাস্টার প্লানিং করেছেন।

❁❁❁

সমস্ত বিষয়াবলি নির্ধারিত এবং ফয়সালাকৃত বলে যুক্তি প্রদর্শনের হুকুম

মানুষের সমস্ত কিছু পূর্ব থেকে ফয়সালাকৃত ও নির্ধারিত হওয়ার দোহাই দিয়ে তার উপর অত্যাবশ্যকীয় কর্মাবলি ছেড়ে দেওয়ার কোন অধিকার নেই। কেননা এ জাতীয় খোঁড়া যুক্তি দেওয়াটাও আরেকটি এমন গুনাহ যার কারণে সে বিচারের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তায়ালা তো বলেই দিয়েছেন

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ﴾

[سورة البقرة:٢٨٦].

অর্থ: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে ভালো যা অর্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর সে মন্দ যা অর্জন করে তারও প্রতিফল তারই"।

বস্তুত এ মাসয়ালা পূর্বের মাসয়ালার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা সেখানে আলোচনা করেছি, একজন মানুষ তার স্বয়ং ইখতিয়ারকৃত কর্মের কারণে হিসাবের সম্মুখীন হবে। যেমন ধরুন, যদি সে সালাত আদায় করে তাহলে এর বিনিময়ে ছাওয়াব পাবে এবং বিপরীতে সে যদি সালাত ত্যাগ করে তাহলে শাস্তি পাবে। এখন তার এ খোঁড়া যুক্তি দেওয়া শুদ্ধ হবে না যে, আমি যা করেছি তা তো পূর্বেই ফয়সালাকৃত ও অবধারিত ছিল। কেননা প্রত্যেক বিবেকবানই এটা জানে যে, সে তার কর্মকে নিজের পছন্দেই গ্রহণ করেছে। আর এ কারণেই তাকে কিয়ামতের দিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

পাশাপাশি একজন মুমিনের জন্য আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা এবং তাকদীরে সন্তোষ প্রকাশ করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোন সৃষ্টির ফয়সালার ক্ষেত্রে আপত্তি না তোলা (১)। সুতরাং ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি মন্দ কিছু ঘটে অথবা ব্যক্তি যদি কোন অপরাধ করে তাহলে আল্লাহর

---

(১) যেমন কারো কারো এভাবে বলা যে, এটা এমন হলো কেন?! এমনও তো হতে পারতো!! এজাতীয় ঈমান বিধ্বংসী কথা। নাউযুবিল্লাহ।

প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ করা জায়েয হবে না। কাজেই সে যেমনিভাবে অনুদান ও কৃপায় সন্তুষ্ট থাকে, তেমনিভাবে এর বিপরীত অবস্থায়ও সন্তুষ্ট থাকবে।

তবে এর মানে এই না, কোন মুমিন কুফুরী, অপরাধ, কবিরাগুনাহ এবং পাপ সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রেও সন্তুষ্ট থাকবে। বরং সে নিজেকে পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সচেষ্ট রাখবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রেও সাধ্য আর সক্ষমতা অনুযায়ী উদ্যমী হবে।

এজন্যই আলিমদের থেকে প্রসিদ্ধ একটি উক্তি আছে যে তারা বলেন: আমরা আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় সন্তোষ প্রকাশ করি অর্থাৎ আমরা তার ফয়সালার উপর আপত্তি করি না। কিন্তু আমরা ফয়সালাকৃত বিষয়টি যদি অপরাধমূলক হয় তাতে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করি না, অর্থাৎ এর প্রতিফলিত হওয়াকে আমরা ঘৃণা করি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ ﴾ [سورة الزمر:٧].

অর্থ: "তোমরা কুফর অবলম্বন করলে নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি নিজ বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন"।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্যশীলদের প্রতিদান এবং অবাধ্যচারীদের শাস্তির হুকুম

আল্লাহ তায়ালা তার করুণা ও দয়াগুণে মুমিনদেরকে ক্ষমা এবং মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা ইনসাফসরূপ কাফের এবং অবাধ্যচারীদের শাস্তি ও যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সতর্কবার্তা দিয়েছেন। আর এগুলো আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٧﴾ ﴾ [سورة آل عمران:٥٦-٥٧].

অর্থ: "অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে- তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না"।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেন:

﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾ [سورة النساء:١٤].

অর্থ: "যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি"।

অতএব এ বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর একটি স্পষ্ট বিষয় বরং কোন রকম মতপার্থক্য ব্যতীত মুসলিমরা এ বিষয়ে ইজমা করেছেন। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি শরীয়ত বর্ণিত বক্তব্য অনুযায়ী তার আনুগত্য এবং ঈমানের বদৌলতে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর পাপী ব্যক্তি তার পাপের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হবে। তবে যে তওবা করবে এবং আল্লাহর অনুগামী হবে আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কাছে এটা জ্ঞাত বিষয় যে, আল্লাহ তায়ালা ইরাদা বা ইচ্ছার গুণে গুণান্বিত এবং তার "ইচ্ছা" সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নিরংকুশ। তার ইচ্ছাকে কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সুতরাং তিনি না কোন কিছুর উপর বাধ্য, না কোন কাজ করতে বলপ্রয়োগকৃত।

এ মর্মকথা থেকেই আমরা বলি, আনুগত্যকারীকে পুরস্কার এবং অবাধ্যকে শাস্তি আল্লাহ তায়ালার উপর কোন আবশ্যিক বিধান নয়। আর

কীভাবেই বা আবশ্যক হবে অথচ তিনি হলেন সত্যনিষ্ঠ প্রভু, যথার্থ উপাস্য, যার ইচ্ছা ছাড়া তার কর্তৃত্বের কোন কিছুই পরিচালিত হয় না?!

তাছাড়া রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, আল্লাহর নৈকট্যে আগুয়ান হও এবং আশান্বিত থাকো। কেননা তোমাদের কাউকেই তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকেও না? তিনি বললেন: আমাকেও না। তবে আল্লাহ্ আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে আবৃত রেখেছেন" (বুখারী, ৬৪৬৭)। সুতরাং এ হাদীস এটা নির্দেশ করে, মুমিন এবং আনুগত্যকারীদের জন্য পুরস্কার তাদের উপযুক্ততার জন্য নয় বরং আল্লাহ তায়ালার অপার করুণা এবং ইহসানের বদৌলতেই।

বরং আমরা তো স্বীকার করি: এ অস্তিত্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার যত কর্ম পরিচালিত হয় সবই তার ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা থেকে যত কর্ম প্রকাশিত হয় সবই উত্তম ও সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা চাইলে কোন কিছু করেন, আবার চাইলে না করেন। কেউ তার উপর কোন কিছু আবশ্যক করতে পারে না। নবী ﷺ তাঁর কতক কন্যাকে বলেন: "তুমি সকালে উঠে বলবে: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রসংশার সাথে; কারো কোন শক্তি নেই আল্লাহ্‌র শক্তি ব্যতীত; আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। অতঃপর যে ব্যক্তি সকালে উঠে তা বলবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর যে সন্ধ্যায় বলবে সে ভোর উপনীত হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে" (আবু দাউদ, ৫০৭৫)। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ﴾

অর্থ: "তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না আর তারাই জিজ্ঞাসিত হবে"।

এই আনুগত্যের কারণে বান্দাদের সওয়াব দেওয়া হবে এটা আল্লাহর অপার করুণা এবং ইহসান সরূপ, বান্দার আবশ্যিক অধিকার বা উপযুক্ততা সরূপ নয়। বরং বাস্তবিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বান্দার সমস্ত উত্তম কর্ম কোন কিছু পাওয়ারই সমানুপাতিক না। কেননা বান্দা তো

তার প্রভু থেকে করুণা এবং ইহসান ব্যতীত কোন কিছু প্রাপ্তিরই অধিকার রাখে না। আর হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি: "তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তার নেক আমল কস্মিনকালেও জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। লোকজন প্রশ্ন করল: হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকেও নয়? তিনি বললেন: আমাকেও নয়, তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর করণা ও দয়া দিয়ে আবৃত করেছেন। কাজেই মধ্যমপন্থা গ্রহণ কর এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে ভালো লোক হলে (বয়স দ্বারা) তার নেক আমল বৃদ্ধি হতে পারে। আর খারাপ লোক হলে সে তাওবাহ করার সুযোগ পাবে" (সহীহ বুখারী, ৫৬৭৩)।

আর অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা দুর্ভাগাদের শাস্তির সম্মুখীন করবেন বস্তুত তার ন্যায়পরায়ণতার কারণেই, যেহেতু তারা কুফুরী করেছে এবং আল্লাহ তায়ালার নিষেধকৃত মন্দ কর্মাবলি কামাই করেছে। কখনো আবার মুমিন অবাধ্যচারীদের আল্লাহ মাফও করে দিতে পারেন, যদিও তারা কবিরা গুনাহ করে। কেননা এটা তো আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার অধীন। কাজেই তিনি চাইলে মাফ করে দিতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন। আর এটা এজন্য যে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾

অর্থ: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন সর্বনিকৃষ্ট অপবাদ আরোপ করল"।

সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান এর মর্মকথা:

সাঈদ বা সৌভাগ্যবান হচ্ছে ঐ মুমিন, যে ঈমান এনেছে এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরিশেষে আল্লাহর অশেষ কৃপায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর মুমিন ব্যক্তিকে "সাঈদ" বা সৌভাগ্যবান নামে নামকরণ করা হয় কেননা প্রকৃত সৌভাগ্য তো বান্দাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তাওফিক প্রদানেই নিহিত। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি ঈমান একজন বান্দার জন্য সমস্ত কল্যাণ অর্জনের সিঁড়ি। বরং বান্দা যা লাভ করে এগুলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ফলেই সহজ হয়। আর কঠিন বিপদও দূর হয়ে যায় যখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে।

আর শাকী বা দুর্ভাগ্যবান হলো ঐ কাফের, যে কুফুরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তার নিকট সত্যের দাওয়াত পৌঁছেছিল, যথেষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছিল এবং যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর একজন কাফেরকে "শাকী" বা দুর্ভাগা নামে নামকরণ করা হয় কেননা প্রকৃত র্দুভাগ্য হলো আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতায়। আর এটা এভাবে যে, একজন কাফের জানেই না, তার একজন প্রভু আছে, তার দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা আছে এবং আল্লাহ তায়ালা তার দীক্ষার জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন। তো তার এ অজ্ঞতার কারণে তার সমস্ত বাহ্যিক নিয়ামতগুলো কল্যাণ বর্হিভূত ও মূল্যহীন হয়ে যায়। কেননা একজন কাফের এমন জটিল আত্মিক শূন্যতায় জীবন-যাপন করে যা মুমিনরা উপলব্ধিই করতে পারে না।

এজন্য জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "যে আল্লাহ তায়ালাকে পেল সে কিছুই হারাল না, আর যে আল্লাহ তায়ালাকে হারালো সে কিছুই পেল না"। আর এটা এজন্যই, আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভই সমস্ত কিছুর মূলে। -আল্লাহর কাছে আমরা দুর্ভাগা না হয়ে সৌভাগ্যবান হয়ে মৃত্যুবরণ করার মোনাজাত করছি-।

এ গুরুত্বপূর্ণ মর্মবাণীগুলো আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে তার প্রজ্ঞাপূর্ণ আয়াতে প্রতিপাদন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ * وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾﴾ [سورة هود:١٠٥-١٠٨].

অর্থ: "যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান। অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোজখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদিগার যা ইচ্ছা করতে পারেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়"।

কিয়ামতের দিন মুমিনদের আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভের প্রামাণিকতা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভকে সাব্যস্ত করে। তারা এটাকে অস্বীকার করে না। এ আলোচ্য বিষয়ে মূলনীতি হলো, আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺ এর বাণীর সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা। কেননা পুরো বিষয়টাই আল্লাহ তায়ালার। তিনি যদি চান আমরা তাকে দেখি তাহলে তার অপার কৃপা আর নেয়ামতের

গুণেই আমরা তাকে দেখবো। আর যদি তিনি এটা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন তাহলে তো কেউই তার উপর কিছু আবশ্যক করতে পারে না। কাজেই এ প্রশ্নের জবাবে একজন মুমিনের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে এ ব্যাপারে অবগত হওয়া যে, আমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাকে দেখবো কি দেখবো না।

তো কুরআন সুন্নাহর নুসুস থেকে এ মাসয়ালার জবাব সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣﴾ [سورة القيامة:٢٢-٢٣].

অর্থ: "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার পানে তাকিয়ে থাকবে"।

নবী করীম ﷺ বলেন: "নিশ্চয়ই অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখবে, যেভাবে এই চাঁদকে দেখো যা দেখতে গিয়ে তোমাদের ভীড় করতে হয় না" (সহীহ বুখারী, ৫৫৪)। এছাড়াও কিয়ামতের দিনে মুমিনদের আল্লাহ তায়ালার দিদার পাওয়ার ব্যাপারে কুরআন হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা রয়েছে।

তবে এখানে সতর্ক থাকা দরকার, কিয়ামতের দিন মুমিনদের আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ আমাদের নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ আকিদাকে নাকচ করে না "আল্লাহ তায়ালার অনুরূপ কিছুই নেই, তিনি সৃষ্টির সাথে দেহগত বা পরিসীমাগত কোন সাদৃশ্যই রাখেন না"।

এজন্য আমাদের এ বিশ্বাস রাখাও দরকার- কিয়ামতের দিন আমাদের আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ দুনিয়ার জীবনে অভ্যস্ত দেখাদেখির মতো নয়। কেননা দুনিয়াতে আমরা যাই দেখি তা কোন না কোন পদার্থ (জিসিম) এবং নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। আর আল্লাহ তায়ালা জিসিমও (পদার্থ) না সীমাবদ্ধও না। বরং আমরা বিশ্বাস করি মুমিনরা সাদৃশ্যতা, উপমা নিরূপণতা, দেহত্বতা, স্থানগত ও পরিমাপগত দূরত্ব এবং দিক বর্জিতভাবেই তাদের প্রভুকে দেখবে।

মোটকথা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কিয়ামতের দিন মুমিনদের আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভকে সাব্যস্ত করেন। সাথে সাথে তারা

সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য এবং সীমা-পরিসীমা, দিক, পরিধি (হাইয়িয), স্থান বা এজাতীয় অন্যান্য বিষয় থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে পবিত্র (তানযীহ) ঘোষণা করেন। আসলে দুনিয়ার মানুষের সাথে নিহিত বস্তুগত ধারার দিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি কল্পনা করা একটু কঠিনই বটে। কিন্তু এটাই সত্য এবং এর উপর ঈমান আনা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন দুনিয়ার প্রচলিত বস্তুগত ধারাকে ছিন্ন করে দিবেন। আর এটা হতেই পারে, কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সমস্ত ধারার (عادة) সৃষ্টিকর্তা। কাজেই তিনি চাইলে এ ধারাকে ছিন্নও করে দিতে পারেন।

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ইস্তিওয়া (الاستواء) এর তাৎপর্য

আরবী ভাষার ব্যাকরণ এবং আরবদের পরস্পর সম্বোধন ও কথাবার্তার ধরনের দিকে লক্ষ করলে কুরআনে কারীমে বর্ণিত ইস্তিওয়া শব্দের মর্মকথা বুঝা যায়। কুরআনে কারীমের অধিকাংশ আয়াতে এর দ্বারা ব্যবস্থাপনা, নিরূপণ এবং সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ ﴾ [سورة البقرة:٢٩].

অর্থ:"অতপর আল্লাহ তায়ালা আসমানের দিকে লক্ষ করলেন এবং সেগুলোকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করলেন।"

এ ক্ষেত্রে ইমাম ত্বারী (রহ:) তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন: এখানে ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী অর্থ হলো, তিনি আসমানসমূহের কতৃত্বগ্রহনমূলক তার ক্ষমতারগুণে সেগুলোকে ব্যবস্থাপনা করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন"(১)।

---

(১) ত্বারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর (মৃ: ৩১০ হিঃ), *জামেউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন*, (মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, ২০০০ সাল) ১ম সংস্করণ, তাহকীক: আহমদ শাকের।

তবে এখানে একজন মুসলিমের সতর্ক থাকা জরুরী যে, এখানে সমুন্নত (علو) এবং ঊর্ধ্বতা (ارتفاع) দ্বারা তার ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনার ঊর্ধ্বতার কথা বুঝানো হয়েছে, স্থানগত বা দিকগত উর্ধ্বতা নয়। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার মতো কিছুই নেই। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির কোন গুণ যেমনঃ কোন দিকে বেষ্টিত থাকা বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ইত্যাদি দ্বারা গুণান্বিত করাও যায়েয হবে না ।

আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জানার ক্ষেত্রে (أين বা কোথায়?) শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা

শরীয়তের দৃষ্টিতে মূলনীতি হলো (আল্লাহ কোথায়?) এ জাতীয় বাক্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। কেননা ভাষাগতভাবে (أين বা কোথায়?) শব্দটি মূলত স্থান জানার জন্য প্রশ্নবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর আল্লাহ তায়ালা মৌলিকভাবে কোন স্থানে অবস্থান করেন না পাছে তাকে (أين বা কোথায়?) দ্বারা প্রশ্ন করা যাবে।

আর যদি (أين বা কোথায়?) শব্দ দ্বারা রূপকার্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, আর সেটা হলো মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি জানার জন্য প্রশ্ন করা, তাহলে শরীয়তে তা জায়েজ আছে। আর উসমান ﷺ এর বক্তব্যে এ মর্ম বর্ণিত হয়েছে যে, সাওসা ইবনে সুহান (রহঃ) তার কাছে খুব বেশি কথা বলতে লাগলো। অতপর তিনি বললেনঃ

أيُّها النَّاس إنّ هذا البَجْبَاجَ النَّفَّاجَ لا يدري ما الله ولا أين الله....

অর্থঃ হে লোকেরা! এই বড়াইকারী বাচাল জানে না আল্লাহ কি এবং তার মর্যাদাগত অবস্থান কোথায়...

এর মর্মকথা হলোঃ এ ব্যক্তির বকবকানি এবং যেকোন স্থানে হঠাৎ করে অবাঞ্ছিত কথা বলার মন্দ গুণ ঐ ব্যক্তির মতো, যে আল্লাহ

তায়ালাকে সমস্ত কথার শ্রবণকারী এবং সমস্ত স্থানে সংগঠিত বিষয়াবলির সম্যক অবগত সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করতে পারে না (১)

তাছাড়া (أين الله বা আল্লাহ কোথায়?) বাক্যটি হাদীসে জারিয়াতেও বর্ণিত হয়েছে, সেটাতে এসেছে "বর্ণনাকারী বলেন: আমার এক দাসী ছিল সে উহুদ ও জাওওয়ানিয়্যাহ্ এলাকায় আমার বকরিপাল চরাত। একদিন আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে দেখলাম তার বকরিপাল থেকে বাঘে একটি বকরি নিয়ে গিয়েছে। আমি তো অন্যান্য আদম সন্তানের মতো একজন মানুষ, তাদের মতো আমিও ক্ষোভে চপেটাঘাত করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসলাম (এবং সব কথা বললাম) কেননা বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুতর মনে হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে (দাসী) মুক্ত করে দিব? তিনি বললেন: তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুতরাং আমি তাকে এনে রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে হাজির করলাম। তিনি তাঁকে (দাসীকে) জিজ্ঞাসা করলেন: (বলো তো) আল্লাহ কোথায়? সে বলল- আকাশে। নবী ﷺ বললেন, (বলো তো) আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তাকে মুক্ত করে দাও, সে একজন মু'মিনাহ্ নারী। (সহীহ মুসলিম, ৫৩৭)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় **হাফেয ইবনু ফুরাক (রহ:) বলেন:** ভাষার বাহ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে (أين বা কোথায়?) শব্দকে স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য গঠন করা হয়েছে, এবং এটা এ শব্দের মৌলিক অর্থ। তবে আরবরা জিজ্ঞাসিত বস্তুর স্থান ছাড়াও ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে। যেমন তারা অন্বেষণকারীর নিকট অন্বেষিত সত্তার পদমর্যাদা অবগত করার প্রাক্কালে বলে: অমুকের মর্যাদা তোমার থেকে কোথায়, আমীরের বিপরীতে অমুকের অবস্থান কোথায়? অনুরূপভাবে তারা দুটি স্তরের মাঝে পার্থক্য সাধনের জন্য এটা ব্যবহার করে, যেমন তারা বলে: অমুক অমুক থেকে কোথায়? তো

---

(১) যামাখশারী, আবুল কাসেম যারুল্লাহ মাহমুদ ইবনে আমর (মৃ: ৫৩৮ হিঃ), *আল-ফায়েক ফি গারিবিল হাদীস,* (লেবাননঃ দারুল মারেফাহ) দ্বিতীয় সংস্করণ, তাহকীক: আলী আল-বাযায়ী ও মুহাম্মদ আবুল ফদ্বল ইবরাহীম, খ. ১, পৃ ৭৮।

তারা এর দ্বারা স্থান বা অবস্থানকে উদ্দেশ্য নেন না বরং মানগত ও মর্যাগত অনুসন্ধানকেই উদ্দেশ্য নেন। সুতরাং আরবী ভাষায় যদি এ অর্থের প্রচলন থাকে তাহলে এ কথা বলার অবকাশ আছে যে: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (أين الله বা আল্লাহ কোথায়?) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কৃতদাসীর নিকট এবং তার হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার শান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ, তিনি সমুন্নত মর্যাদা ও মহা সম্মানের অধিকারী (১)

ইমাম খাত্তাবী (রহ:) বলেন: বস্তুত এ প্রশ্নটি ছিলো ঈমানের নিদর্শন ও ইহার অধিকারী ব্যক্তির লক্ষণ বুঝার জন্য, ঈমানের মৌলিকত্ব বা মৌলিক বৈশিষ্ট্য জানার জন্য নয়। কেননা যদি কোন কাফের কুফর থেকে দ্বীন ইসলামে পরিবর্তিত হতে চায় এবং ঈমানের স্বীকৃতি হিসেবে ঐ দাসী যা বলেছে তাই বলে তাহলে সে এর মাধ্যমে মুসলিম হিসেবে রূপায়িত হবে না যতক্ষণ এ সাক্ষ্য দেয়, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল" এবং যতক্ষণ না পূর্বে যে দ্বীনের বিশ্বাস করতো তা থেকে মুক্ত হয় (২)

ইমাম নববী (রহ:) বলেন: নবী কারীম ﷺ এর বাণী: "(বলো তো) আল্লাহ কোথায়? সে বলল- আকাশে। নবী ﷺ বললেন, (বলো তো) আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: তুমি তাকে মুক্ত করে দাও, সে একজন মু'মিনাহ্ নারী", এই বাণীটি সিফাতের হাদীস সমূহের একটি। এ মাসয়ালায় দুইটি মত বিদ্যমান, যা বহুবার কিতাবুল ঈমানে উল্লেখিত হয়েছে।

একটি হলো: এটার প্রকৃত অর্থ তালাশে নিমগ্ন না হয়ে এর একটি অর্থ আছে বলে ঈমান রাখা। সাথে সাথে এ বিশ্বাস রাখা, আল্লাহ তায়ালার অনুরূপ কিছুই নেই এবং তাঁকে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র ঘোষণা করা।

---

(১) ইবনু ফুরাক, আবু বকর মুহাম্মদ বিন হাসান বিন ফুরাক আল-আনসারী আল-ইস্পাহানী, (মৃ: ৪০৬ হিঃ), *মুশকিলুল হাদীস ওয়া বায়ানুহু,* (বৈরুত: আলামুল কুতুব, ১৯৮৫ সাল), দ্বিতীয় সংস্করণ, তাহকীক: মুসা আলী, পৃ. ১৫৮ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

(২) খত্তাবী, আবু সুলাইমান হামদ বিন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে খাত্তাব আল-বুসতী (মৃ: ৩৮৮ হিঃ), *মায়ালিমুস সুনান,* (হলব: মাতবায়াতুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৩২ সাল) প্রথম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ২২২।

দ্বিতীয়টি হলো: আল্লাহর শানে উপযোগী মর্মে তাওয়ীল তথা ব্যাখ্যা করা। যারা এ পন্থা অবলম্বন করেন তারা বলেন: হাদীসের ঐ বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ দাসীকে পরীক্ষা করা; সে আসলেই কি এমন একত্ববাদী যিনি স্বীকৃতি দেন: সৃষ্টিকর্তা, ব্যবস্থাপক এবং মহাপ্রভাবশালী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা? তিনি তো সেই সত্তা যখন তাকে দোয়াকারী ডাকে তখন আসমানমুখী হয়ে ডাকে, যেরকম নামাযী যখন তাকে সিজদাহ করে তখন কিবলামুখী হয়ে করে। এরমানে এই না তিনি আসমানে আছেন যেরকম ভাবে তিনি কা'বার মধ্যেও নন। বরং এটা এজন্য যে আসমান হচ্ছে দোয়াকারীদের কিবলা যেরকম কা'বাঘর হচ্ছে নামাযীদের কেবলা। অথবা এর মর্ম হলো: ঐ দাসী ছিলো পৌত্তলিক; যে দৃশ্যমান প্রতিমার পূজা করতো। অতঃপর যখন বললো: তিনি আসমানে তখন তিনি বুঝলেন এ দাসী একত্ববাদী; প্রতিমা পূজারী নন"।[১]

মোটকথা আল্লাহ তায়ালা স্থানের বেষ্টন থেকে পবিত্র। অথবা তার শানে (أين বা কোথায়?) শব্দ দিয়ে জানতে চাওয়া থেকে পবিত্র, অর্থাৎ এর আক্ষরিক অর্থ দিয়ে, আর এর আক্ষরিক অর্থ হলো, স্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া। কেননা তিনি স্থান ও কালের স্রষ্টা।

আর আমাদের উপর আবশ্যিক কর্তব্য হলো, এগুলো ছোট ছেলে- মেয়েদের শিক্ষা দেয়া এবং তাদের বুঝক্ষমতা অনুযায়ী তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া এবং এমনভাবে জবাব দেয়া যেটা তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিবে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত।

(১) নববী, আল-মিনহায শরহু সহিহিল মুসলিম, খ. ৫, পৃ. ২৪।

ইলাহিয়্যাত অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

উল্লেখিত বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনা সংশ্লিষ্ট মাসায়েল।

আর এ অধ্যায়ে যেই সামগ্রিক বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক এবং যেটা পূর্বালোচ্য বিষয়ের সারকথা, সেটা হলো: আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের সাথে আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমান আনা। আমাদের জানা এবং অজানা সমস্ত ত্রুটিমুক্ত ও মর্যাদাময় গুণাবলি তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা। পাশাপাশি সমস্ত ত্রুটিযুক্ত এবং সৃষ্টির সাথে যে কোন ভাবে সাদৃশ্য রাখতে পারে এমন সমস্ত কিছু থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। পাশাপাশি সাব্যস্ত করা যে, তিনি হলেন মানুষের কর্মের স্রষ্টা, এবং তিনি তাদের থেকে সংগঠিত কর্মের হিসাব নিবেন। মুমিনদেরকে তার রহমত ও করুণার বদৌলতে প্রতিদান দিবেন। আর কাফেরদেকে তার ন্যায়পরায়ণতা স্বরূপ শাস্তি দিবেন।

ইলাহিয়্যাত সংশ্লিষ্ট আকিদার উপরোক্ত সমস্ত কিছু তাওহীদের সাক্ষ্য (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) এর মাঝেই নিহিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবুওয়্যাত

ইসলামী আকিদার অত্যাবশ্যকীয় বিশ্বাসাবলীর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখার সাথে সাথে একজন মুকাল্লাফ ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে, আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের) প্রতি ঈমান রাখা। এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামায়ে কেরাম তাদের আকিদার কিতাবে নবুওয়্যাত সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় গঠন করেছেন।

আর সামনে ঐসকল গুরুত্বপূর্ণ আকিদার মাসয়ালা আলোচনা করা হবে যেগুলো একজন মুকাল্লাফের জন্য জানা এবং সেগুলোতে সুদৃঢ় থাকা আবশ্যক, কোনক্রমেই এগুলোকে উপেক্ষা করা কিংবা এগুলোর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার বৈধতা নেই। এগুলো এমন আকিদা যা মুমিনের ঈমানী শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করে, ইবাদাতকে সমৃদ্ধ করে এবং হৃদয়ের মাঝে দীন ইসলামকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা 'নবী' মানবজাতির উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক মহান নিয়ামত। এমনকি তাদের উপর বিশ্বাস রাখা ব্যতীত একজন মুমিনের ঈমানই পরিশুদ্ধ হয় না। কেননা এটা তাওহীদের স্বীকৃতির দ্বিতীয় মৌলিক দিক: (وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله)।

নবীদের ক্ষেত্রে একজন মুকাল্লাফের আবশ্যিক আকিদাগুলোকে কিছু সংখ্যক ইমাম; যেমন ইমাম সানুসী রহ. তিন প্রকারে ভাগ করার অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন:

প্রথমত: রাসূল এবং নবীগণের আ. জন্য আবশ্যিক বিষয়াবলি।

দ্বিতীয়ত: রাসূল এবং নবীগণের আ. ক্ষেত্রে অসম্ভব বিষয়াবলি।

তৃতীয়ত: রাসূল এবং নবীগণের আ. ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়াবলি।

অতএব একজন মুকাল্লাফ যখন এসকল বিষয়গুলো বুঝবে এবং ধারন করবে তখন তার উপর নবীদের ব্যাপারে আকিদাগত বিষয়াবলি জানার বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন করবে।

রাসূল ও নবীর অর্থ:

অনেক আলেম বলেছেন, নবী শব্দের অর্থ রাসূল শব্দের অর্থ থেকে আলাদা। আর এটাই জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামায়াতের মত। তারা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [سورة الحج:٥٢].

"আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়"।

এ আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে রাসূলকে নবী শব্দের উপর আত্ফ (সংযোজন) করা হয়েছে। আর আতফ (সংযোজন) উভয়ের মাঝে বৈপরীত্যতা সাধন করে। (১)

শরহুল আকায়েদ আন-নাসাফিয়াহ কিতাবে ইমাম সাদ উদ্দিন তাফতাযানী (রহ:) বলেন: "রাসূল হলো এমন মানুষ যাকে আল্লাহ তায়ালা হুকুম আহকাম প্রচারের জন্য সৃষ্টিজীবের কাছে প্রেরণ করেছেন। রাসূল

---

(১) বিষয়টি আরবী ব্যাকরণ সংশ্লিষ্ট। সারকথা হলো যখন দুইটি শব্দকে আলাদা আলাদা উল্লেখ করা হয় তখন দুটি শব্দ আলাদা তাৎপর্যের দিকনির্দেশ করে। এখানে সেটাই লক্ষণীয়। এখানে নবী ও রাসূল শব্দযুগলকে ভিন্ন মর্মে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। [অনুবাদক]

হওয়ার ক্ষেত্রে কখনো কখনো কিতাব থাকাও শর্ত করা হয়। কিন্তু নবী এর বিপরীত, কেননা তার অর্থ আরো ব্যাপক।"(১)

আর নবী হলেন তিনি যিনি: স্বাধীন, পুরুষ, স্বাভাবিকভাবে সমস্ত আপত্তিকর বিষয় থেকে মুক্ত, যাকে কোন আমলযোগ্য শরীয়তের প্রত্যাদেশ করা হয়েছে এবং যিনি মানুষের কাছে শরীয়ত পৌঁছে দিতে আদিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ﴾ [سورة الحج:٧٥].

অর্থ: আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা!

কেউ আবার বলেন, রাসূল এবং নবী সমার্থবোধক।

কেউ কেউ রাসূল এবং নবীর মাঝে প্রার্থক্য সাধনকল্পে বলেন, রাসূল হলো যাকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে। নবী এর বিপরীত, কেননা এরূপ হয় যে তাকে মানব সমাজে প্রেরণ করা হলো কিন্তু তার সাথে স্বতন্ত্র কোন কিতাব নেই, বরং তিনি পূর্ববর্তী কিতাবকে আঁকড়ে ধরেই দাওয়াতের পুনঃজোয়ার ঘটান।

নবী ও রাসূল প্রেরণের পটভূমি:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শনের জন্য রাসূল এবং নবীদের প্রেরণ করেছেন, যাতে করে মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারে এবং তার ইবাদত করতে পারে। শুধু তাই না যাতে তারা তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ পৌঁছে দিতে পারে,

---

(১) তাফতাযানী, সাদ উদ্দীন মাসউদ ইবনে ওমর (মৃ: ৭৯৩ হিঃ), *শরহুল আকায়েদ আন-নাসাফিয়াহ মায়া হাশিয়াতুল খিয়ালী ওয়াল ইসাম,* (মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, ২০০৪ সাল), পৃ. ৩১।

তাদের বিষয়াবলি সুবিন্যস্ত হতে পারে এবং উত্তম জীবনাচার গঠিত হতে পারে। এখানেই শেষ নয় বরং যাতে মানুষরা বিশৃংঙ্খলা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং রাসূল এবং নবীগণ হলেন সমস্ত সৃষ্টিজীবের উত্তম শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও মুরব্বী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١ فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢﴾ [سورة البقرة:١٥١-١٥٢].

অর্থ:"যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্ববিজ্ঞান এবং শিক্ষা দিবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"

অনুরূপভাবে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির মাঝে রাসূল প্রেরণ করার ইচ্ছা করেছেন মূলত মানুষকে পরীক্ষা করতে যে, তারা সঠিক জীবনব্যবস্থার অনুসারী কিনা। তাহলে সত্যের অনুসারীরা স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং বাতিল সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٣٣﴾ [سورة التوبة:٣٣].

অর্থ:"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।"

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ﴾ [سورة البقرة:٢١٣].

অর্থ:"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন"।

তাছাড়া এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত যে, তিনি সৃষ্টিজীবের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে রাসূলদের প্রেরণ করেছেন অনুগ্রহস্বরূপ। এটা তার উপর আবশ্যক ছিল বলে নয় বরং নির্ভেজাল পরম করুণা ও অপার দয়াগুণে।

রাসূলগণের আ. নাম জানার আবশ্যকতা

কুরআনে কারীমে নাম সহকারে বর্ণিত সমস্ত রাসূলের ব্যাপারে অবগত থাকা একজন মুমিনের উপর ওয়াজিব। অর্থাৎ যখন তাকে কোন রাসূলের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে যে: তিনি রাসূল, কি রাসূল না? তখন তার এর উত্তর জানা থাকা আবশ্যক। কুরআনে উল্লেখিত এরূপ নবী-রাসূলগণের সংখ্যা সর্বোমোট পঁচিশজন, তারা হলেন:

আদম, নূহ, ইদরীস, হূদ, সালেহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইয়াসা, যুলকিফ্‌ল, ইলইয়াস, ইউনুস, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসুফ, শুয়াইব, মু'সা, হারুন, দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং মুহাম্মদ (আলাইহিমুস সালাম)।

তবে তাদের সবার নাম মুখস্থ রাখা মুস্তাহাব যাতে একজন মুমিনের তাদের প্রতি ভালোবাসা ও অনুসরণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এবং যাতে তাদের

সৌরভময় গুণাবলি জানা যায় এবং তাদের অনুসরণ করা যায়। বিশেষ করে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের।

অনুরূপভাবে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত নবী-রাসূল ব্যতীতও অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যদিও আমরা তাদের নাম, এলাকা ও সম্প্রদায় সম্পর্কে না জানি। সুতরাং আমরা যাদের ব্যাপারে অবগত এবং যাদের ব্যাপারে অবগত নই সবার ব্যাপারেই সামগ্রিকভাবে ঈমান আনবো। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [سورة غافر:٧٨].

অর্থ:"আমি আপনার পূর্ব অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি"।

নবী-রাসূলগণের (আ.) ক্ষেত্রে আবশ্যিক আকিদা

আল্লাহর রাসূলগণ হলেন, মানুষ এবং আল্লাহর মাঝে প্রধান মিডিয়া তথা মধ্যস্ততাকারী, তারাই মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচারকারী। আল্লাহ তায়ালার সম্মানপ্রদান থেকেই তারা সম্মানিত এবং তিনিই তাদের মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক নবী অথবা রাসূলকে সম্মান করা একজন মুমিনের জন্য আবশ্যক কর্তব্য। শুধু তাই না, ব্যক্তি তার অন্তরের মণিকোঠায় তাদের জন্য বিশেষ স্থান রাখবে, এভাবে যে তাঁরা তার হৃদয়ে এমন স্থান অধিকার করবেন যা তার পিতা-মাতা, ছেলে-কন্যা, সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এবং প্রেমাস্পদ থেকেও অনেক উর্ধ্বে। বরং আবশ্যক হচ্ছে প্রিয়নবী ﷺ একজন ব্যক্তির নিকট তার জীবন, সত্তা এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবেন। মুমিন তো এমন হবে যে প্রিয় নবী ﷺ এর জন্য নিজের জীবন, সম্পদ এবং পরিবারবর্গকেও উৎসর্গ করে দিবে! কেননা সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামতের মূল কিন্তু নবী-আম্বীয়াগণই, এবং সঠিক পথের

দিশা তাদের মাধ্যমেই পেয়েছে। তাদের শিক্ষাদানের ফলে দুনিয়ার জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আখিরাতের জীবনে তাদের বরকতেই নাজাত পাওয়া যাবে। তারাই হলেন সুপারিশকারী এবং তাদের সুপারিশ আল্লাহ তায়ালার দরবারে গৃহীত হবে।

প্রত্যেক মুকাল্লাফের উপর আবশ্যক হচ্ছে, সমস্ত রাসূল এবং আমাদের নবী ﷺ এর জন্য ঐসমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলি সাব্যস্ত করা যা নবুয়্যাতের মাকাম দাবী করে। সাথে সাথে ঐ সকল নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি নাকচ করা যা তাদের উন্নীত মাকামের সাথে বেমানান।

তেমন কিছু আবশ্যিক গুণাবলি:

১. পাপ থেকে পবিত্রতা (العصمة): তাঁরা কথা এবং কর্মে উভয় ক্ষেত্রেই পাপ থেকে পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা তাদের ভিতর এবং বাহিরকে সমস্ত নিষিদ্ধ কর্মাবলি, বানোয়াট কথা অথবা মিথ্যা কথা থেকে শৈশবকালে ও উপযুক্ত বয়সে, নবুয়্যাতের পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায়ই হেফাযত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল ﷺ সিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [سورة التكوير:٢١].

অর্থ: "সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন"।

আবার সাইয়্যেদুনা মুসা কালিমুল্লাহর সিফাত বর্ণনায় কুরআনে এসেছে:

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [سورة القصص:٢٦].

অর্থ:"কেননা, আপনার মজুর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত"।

শুধু তাই না বরং এ বিশেষ গুণ কুরআনুল কারীমে সুরা শু'য়ারাতে আমাদের সম্মানীয় নবী নূহ, সালেহ, লূত এবং শুয়াইব (আ:) এর শানেও এসেছে:

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ [سورة الشعراء:١٧٨].

অর্থ: "আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর"।

আর কুরআন-সুন্নাহে কতক নবীদের ব্যাপারে এমন কিছু বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর আক্ষরিক অর্থ তাদের ইসমাত বা পবিত্রতার বিপরীতার্থক সেগুলোর আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা যায়েজ নেই। বরং আবশ্যক হচ্ছে এগুলোকে এমন উত্তম তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) করা যা আরবী ব্যাকরণ এবং ঐ বর্ণিত নসের (বা উদ্ধৃতির) গঠনগত অর্থের সাথে সামঞ্জস্যতা থাকে। আর এটা এজন্য যে, যাতে করে এসকল বাহ্যিক অর্থ কুরআন সুন্নাহের মৌলিক উদ্ধৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

এখানে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, এমন কোন শরয়ী, বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে না যা নবীদের ইসমাতের (পাপ থেকে পবিত্রতার) বিপরীত। আর যে সকল বর্ণনা এ ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করে সবগুলোরই সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব। আর এগুলো বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থ এবং হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

২. সত্যবাদিতা (الصدق): এর মানে হলো, বাস্তবতা অনুযায়ী সংবাদ দেওয়া। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সংবাদ কখনো দিবেন না যা সত্যের বিপরীত। এর প্রমাণ হলো তার হাতে বহু মুযিজা প্রকাশিত হয়েছিল। আর এটাই তার সত্যবাদিতার প্রমাণ (১)। আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীও এর প্রমাণ করে:

﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [سورة الزمر:٣٣].

অর্থ:"যারা সত্য নিয়ে আগমন করছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো খোদাভীরু"।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীও এর প্রমাণ বহন করে:

﴿هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ [سورة يس:٥٢].

অর্থ: "রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন"।

---

(১) কেননা মিথ্যুকের হাতে কখনো আল্লাহ মু'যিজা প্রকাশ করেন না, বরং মিথ্যুকের দাবীর বিপরীতটা কখনো হতে পারে যা মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের ক্ষেত্রে হয়েছিল। (অনুবাদক)

৩. বিচক্ষণতা (الفطانة): মেধা এবং বিচক্ষণ হওয়া যাতে করে তাদের দাওয়াকৃত বিষয়ের সত্যতার ক্ষেত্রে যুক্তি পেশ করতে পারেন এবং বিরোধীদের সংশয়গুলোকে বাতিল সাব্যস্ত করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম عليه السلام এর ক্ষেত্রে বলেন:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة الأنعام:٨٣].

অর্থ: "এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী"।

এভাবে সমস্ত আম্বিয়া -আলাইহিমুস সালাম- অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন, কমকথায় বেশি মর্মে অধিকতর জোরদারপূর্ণ প্রমাণ পেশে সক্ষম ছিলেন।

৪. দাওয়াত পৌঁছানো (التبليغ): আল্লাহ তায়ালা যেসকল বিষয় পৌঁছে দেওয়ার আদেশ করেছেন তা তার পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ﴾ [سورة آل عمران:٢٠].

অর্থ: "আপনার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা"।

তিনি আরো বলেন:

﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [سورة المائدة:٦٧].

অর্থ: "হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ

আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"

তাবলীগের দায়িত্বই বস্তুত প্রত্যেক রাসূলের রিসালতের মূল মিশন ও ভিশন। এর মাধ্যমে তারা বান্দাদের কাছে এ বার্তাই পৌঁছে দেন যে তারা আল্লাহর রাসূল, কাজেই তারা যেন এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ﴾ [سورة العنكبوت:١٦].

অর্থ: "স্মরণ কর ইব্রাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন; তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর"।

এ একই আহ্বান বস্তুত অন্যান্য রাসূলদের তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান।

❁❁❁

নবী-রাসূলদের শানে অপ্রযোজ্য বিষয় নাকচ করার আবশ্যকতা

অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলির বিপরীত গুণাবলি রাসূলদের শানে অসম্ভব। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে খিয়ানত, মিথ্যা, নির্বুদ্ধিতা, রিসালাহকে গোপন রাখা এবং দ্বিনী দাওয়াত না দেওয়ার মন্দ বৈশিষ্ট্যাবলি অসম্ভব।

আর যে সকল বর্ণনা নবীদের জন্য পাপ এবং কবিরা গুনাহ সাব্যস্ত করে তার অধিকাংশ বর্ণনাই মিথ্যা ও অশুদ্ধ। এগুলো সাধারণত আহলে কিতাবদের থেকে ইসরাইলী বানোয়াট বর্ণনা। আর এগুলো তারা বর্ণনা করেছে মুখে মুখে চলে আসা কিচ্ছা-কাহিনির ভিত্তিতেই, যার আদৌ কোন সত্যতা নেই। সুতরাং এগুলো গ্রহণ বা এগুলো দ্বারা দলীল পেশ করা কোনটাই জায়েয হবে না। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসমাতুল আম্বিয়ার (বা নবীদের পাপমুক্তিতার) বিপরীতে যেসকল আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো তা'বীল বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং সেগুলো উত্তম গ্রহণযোগ্য অর্থেও ব্যক্ত করা সম্ভব, এ জাতীয় বর্ণনা ও বিবৃতি এবং এগুলোর মর্ম বুঝার বিশুদ্ধ পদ্ধতি নিয়ে উলামায়ে কেরাম অনেক গ্রন্থ সংকলন করেছেন। যেমন: ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহ:) এর *ইসমাতুল আম্বিয়া*।

❁❁❁

নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়াবলিঃ

নবী ও রাসূলগণ (আ:) হলেন সমস্ত মানুষের উপর মর্যাদাপূর্ণ সত্তা। আর এটা হয়েছে যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের নবুওয়্যাত ও রিসালাত প্রদান করেছেন, তাদের হাতে বহু মু'যিজা প্রকাশ করেছেন, তাদের উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং এটা নাযিলের জন্য তাদের নির্বাচন করেছেন, শুধু তাই না তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তার প্রজ্ঞাগুণে নবী-রাসূলদের বাহ্যিকতায় ঐ বিষয়াবলি নির্বাহ করাতে চাইলেন যা মানবীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নির্বাহিত হয়।

এ কারণে মানুষের আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যাবলি যেমন, রুগ্ন হওয়া, খাওয়া, পান করা ইত্যাদি রাসূলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে এ শর্তে, যাতে এর কোন বৈশিষ্ট্যই তাদের উৎকৃষ্ট মর্তবা এবং সম্মানীয় মর্যাদার খাটোকারী না হয়। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে মানুষ দেখে বিরক্তিবোধ করে এমন রোগ যেমন, কুষ্ঠরোগ বা অন্ধ হওয়া ইত্যাদি প্রযোজ্য নয়।[১]

আর নবী-রাসূলদের মানবীয় নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পিছনে হিকমত হলো তাদের উন্নীত মর্যাদাকে আরো বুলন্দ করা, আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান আরো বৃদ্ধি পাওয়া। শুধু তাই না যাতে করে তারা সমস্ত মানব জাতীর কাছে আদর্শের প্রতীক হতে পারেন। অতএব রাসূলরা হলেন মানুষদের মধ্য থেকেই মানুষ, যদিও তারা সর্বোত্তম মানুষ।

---

(১) অতএব, হযরত আউয়ুব আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে যে বলা হয়, তাকে কীড়ায় ধরেছিলো, যার কারনে তার কওমের লোকেরা তাকে ময়লার ভাগাড়েতে নিক্ষেপ করেছিলো; এজাতীয় কথার বিশুদ্ধ কোন ভিত্তি নেই। বরং ইসরাঈলী বানোয়াট বর্ণনার অর্ন্তভুক্ত। যদিও এসকল বর্ণনা কিছু কিছু তাফসীর ও ইতিহাসগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বিস্তারিত দেখুনঃ মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ আবু শাহবাহ, *আল-ইসরাঈলীয়াত ওয়াল মাওদুয়াত ফি কুতুবিত তাফাসীর,* (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪০৭ হি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ.২৭৫। সাইদ আব্দুল লতিফ ফুদাহ, *তাহযিরু শরাহিস সানুসিয়াহ-উম্মুল বারাহীন,* (আম্মানঃ দারুর রাযী, ১৪০৭ হি.), ২য় সংস্করণ, পৃ.১০৫। ড. জামিল হালিম, *কলায়িদুল উম্মাতিল মুরাসসয়া বি আকায়িদিল আয়িম্মাতিল আরবায়া,* (বৈরুতঃ শিরকাতু দারিল মাশারি'ঈ, ২০১৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪১। [অনুবাদক]

মোটকথা নবী-রাসূলগণ হলেন মানুষদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তারা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত নৈকট্য ও মহত্ত্বের জন্য বাছাইকৃত। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সমস্ত পাপ পঙ্কিলতা এবং ভ্রষ্টতা থেকে পবিত্র করেছেন। তাদেরকে শোভিত করেছেন উৎকৃষ্ট সম্মাননা ও সর্বোত্তম গুণাবলি দিয়ে। তাদেরকে সুসজ্জিত করেছেন, জ্ঞান, সৌন্দর্যতা, পরিপূর্ণতা আর মহিমা দিয়ে।

নবুয়্যাত এটা আল্লাহ তায়ালার করুণা, এটি অর্জন বা প্রচেষ্টা করে লাভ হয় না

নবুয়্যাতি প্রদান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কৃপা, এটা আল্লাহ তায়ালা থেকেই নির্ধারিত। তার বিশেষ করুণায় তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এর জন্য নির্বাচিত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ﴾ [سورة الحج:٧٥].

অর্থ: "আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"!

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ﴾ [سورة الأنعام:١٢٤].

অর্থ:"আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে"।

সুতরাং মানুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানী, অধিকতর পরিচ্ছন্ন, অধিকতর নির্মল, সবচেয়ে পবিত্র এবং সবার চেয়ে উত্তম হলেন আম্বিয়া ও রাসূলগণ। নবুয়্যাত এটা কোন প্রচেষ্টার প্রতিফল না। বরং ইবাদতে, দুনিয়া বিরাগতায়, আল্লাহ ভীরুতায় সকল প্রচেষ্টা, জ্ঞানার্জন এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ফযিলত ইত্যাদি ব্যক্তির মর্যাদাকে যত বেশিই বুলন্দ করুক না কেন এবং

আল্লাহ তায়ালার যতই নৈকট্যে পৌঁছাক না কেন তা সর্বদাই নবী-রাসূলদের মর্যাদার নিচে থাকবে। কেননা একজন নবী ঐ মর্যাদা পূর্বেই অর্জন করেছেন, সাথে আরো অনেক মর্যাদা যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। কেননা প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারণে এবং মহীয়ান প্রভুর নৈকট্য প্রদানে। শুধু মানবীয় কর্মের ফলে নবীদের মর্যাদা হয় নাই বরং আল্লাহ তায়ালার তাওফীক ও তার মনোনয়ন প্রদানে হয়েছে।

ইমাম সাদুদ্দিন তাফতাযানী (রহ:) বলেন: "একজন ওলী কখনো নবীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। কেননা নবীগণ হলেন মাছুম, শেষকীর্তির ভয় থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। ওহীপ্রাপ্তি এবং ফেরেশতাদের দেখার মাধ্যমে সম্মানীত। আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার সকল পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত হওয়ার পর শরীয়তের আহকাম এবং সমস্ত মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনে আদিষ্ট"।(১)

সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যমে নবুয়াতের পরিসমাপ্তি

এখানে খুব গুরুত্বের সাথে যেটা উল্লেখ করতে হয়, সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যমে নবুয়্যাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কাজেই ইতিহাসে বর্ণিত অতীতে যে নিজেকে নবী দাবী করেছে, বা বর্তমানে করছে অথবা ভবিষ্যতে করবে সে চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী, দিকভ্রান্ত পথভ্রষ্টকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [سورة الأنعام:٩٣].

অর্থ: "আর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে, অথবা বলে, 'আমার উপর ওহী প্রেরণ করা হয়েছে',

---

(১) তাফতাযানী, সাদ উদ্দীন মাসউদ ইবনে ওমর, (মৃ: ৭৯৩ হিঃ), *"শরহুল আকায়েদ আন-নাসাফিয়াহ"* (কায়রো: মাকতাবাতু কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, ১৯৮৭ সাল) ১ম সংস্করণ, তাহকীক: আহমদ সাকা, পৃ. ১০৫।

অথচ তার প্রতি কোন কিছুই প্রেরণ করা হয়নি? এবং যে বলে 'আমি অচিরেই নাযিল করব, যেরূপ আল্লাহ নাযিল করেছেন"।

আর মুসায়লামা কাজ্জাব, কাদিয়ানী কাজ্জাব এবং অন্যান্যরা যা দাবী করে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তিনি তাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন প্রমাণসরূপ হবেন।

নবীদের মু'জিযা সত্যঃ

নবুয়্যাত শুধু দাবীর দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। বরং নবীর সত্যতার জন্য দলীল প্রয়োজন। আর সেটাই হলো মু'যিজা, যা আল্লাহ তায়ালা তার নবীর হাতে তার দাবীর সত্যায়নে নির্বাহ করেন। যেটা কেমন যেন আল্লাহ তায়ালার এ মর্ম ব্যক্ত করে যেঃ আমার বান্দা আমার থেকে যা পৌছে দেয় সেই ব্যাপারে তিনি সঠিক।

আল্লাহ তায়ালা তার বার্তাকে সমগ্র পৃথিবীবাসীদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য নবীদের প্রেরণ করেছেন। কিন্তু অন্ধঅনুকরণ করে তাদের সত্যায়ন করা সম্ভব না। বরং এমন দলীল প্রয়োজন যা তাদের দাবীর সত্যায়নে, তাদের সত্য কথায় এবং আল্লাহ তায়ালা যে তাদের ওহী প্রদান করেছেন ও মানুষদের কাছে প্রেরণ করেছেন তার প্রমাণ বহন করবে। আর সেই দলীলই হলো মু'যিজা।

পারিভাষিকভাবে মু'যিজা হলোঃ "মোকাবেলাহীন চ্যালেঞ্জ সম্বলিত এক অলৌকিক বিষয়।"(১)

আর আকিদা বিশারদগণের নিকট মু'যিজা হলো, এমন একটি বিষয় যা প্রকৃতির ধারা অনুযায়ী প্রচলিত নিয়মাবলিকে ভঙ্গ করে। যেমন, লাঠি চলন্ত সাপে রূপান্তরিত হওয়া, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

---

(১) আল-আমির, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ (মৃঃ ১২৩১ হিঃ), *হাশিয়াতুল আমির আলা ইতহাফিল মুরিদ শরহে জাওহারতিত তাওহীদ*, (দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ২০০১ সাল), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২২৮।

আঙ্গুল মোবারকের মাঝ থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া। তো এ অলৌকিক বিষয়াবলি নবুয়্যাতের দাবীর সাথে হয়ে থাকে। আসলে আল্লাহ তায়ালা এ জাতীয় মু'যিজা নবী অথবা রাসূলদের হাতে নির্বাহ করেন মানুষকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার জন্য; যে তোমরা পারলে এরকম একটা করে দেখাও। অথচ তা করতে তারা অক্ষম হয়ে যায়। ফলে তাদের অক্ষমতাই প্রমাণ করে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত।

মূলকথা হলো, মু'যিজা হলো আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কর্ম। এটা কোন সৃষ্টি জীবের কাজ না। কেননা জগতের প্রচলিত ধারাকে যিনি প্রচলন করেছেন সেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা ভাঙতে পারে না। এ কারণে ইমাম বাক্বিল্লানী (রহ:) বলেন: "মু'যিজা হলো স্বাভাবিক ধারাকে ভঙ্গকারী আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কর্ম; যা নবীদের (রিসালাতের) দাবীর সত্যায়নকারী এবং সমগ্র জাতির সমীপে এরূপ আরো একটি কর্ম নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ উপস্থাপনা"(১)

বস্তুত নবীগণের মু'জিযা অনেক বেশি, তার প্রসিদ্ধ কিছু হলো

সাইয়্যিদুনা সালেহ ﷺ এর মু'যিজা: প্রস্তরখণ্ড থেকে জীবন্ত উট বের করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

﴿وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفٗا﴾ [سورة الإسراء:٥٩].

অর্থ:"পূর্ববর্তীগণ কতৃক নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলি প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্যে সামুদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশেই নিদর্শন প্রেরণ করি।"

---

(১) আল-বাকিল্লানী, কাযী আবু বকর ইবনু তায়্যিব (মৃ: ৪০৩ হি:), *আল-ইনসাফ ফিমা ইয়াজিব ওয়া লা ইয়াজুয আল-জাহলু বিহি* (মিসর: মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস) তাহকীক: ইমাম জাহীদ আল-কাওসারী, পৃ. ৫৮।

সাইয়্যিদুনা মুসা ﷺ এর মুযিজা: লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ۝١٠﴾ [سورة النمل:١٠].

অর্থ: "আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি। অতঃপর যখন তিনি তাকে সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। হে মূসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না"।

তার আরেকটি মু'যিজা হলো সমুদ্রকে দুভাগে পৃথক করা, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [سورة الشعراء:٦٣].

অর্থ: "অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করো। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল"।

সাইয়্যিদুনা ঈসা ﷺ এর মু'যিজা: আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্যদান। যে রকম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী:

﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم

بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [سورة المائدة: ١١٠].

অর্থ: "যখন আল্লাহ বলবেন: হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র রুহ দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব, প্রগাঢ় জ্ঞান, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মতো প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো, তারা বলল: এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়"।

সাইয়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মু'যিজা: সবচেয়ে বড় শ্বাশত মু'যিজা হলো কুরআনুল আজীম, পবিত্র হাতের লাঠির তাসবীহ পাঠ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, অল্প খাদ্যে অতি বরকত প্রদান; এমনকি তিনি পুরো সৈন্য বাহিনীকে এক থলে খেজুর দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছেন, তার মুবারক আঙ্গুলি থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া, খেজুরের শুষ্ক গুঁড়ির ক্রন্দনসহ আরো অনেক মু'যিজা যা সুন্নাহ, আছার এবং সিরাতের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

এখানেই নবুয়্যাত অধ্যায়ের সমাপনিকা। এখানে আমরা নবী-রাসূল এবং তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি যেগুলো সম্বন্ধে একজন মুকাল্লাফের জানা আবশ্যক তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। অবগত হয়েছি তাদের আবশ্যক গুণাবলি যথাক্রমে: সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে। পাশাপাশি জেনেছি তাদের শানে অপ্রযোজ্য দোষ-ত্রুটি যথাক্রমে: মিথ্যা, অবাধ্য হওয়া, দাওয়াত না পৌঁছিয়ে গোপন রাখা ইত্যাদি। সাথে সাথে জেনেছি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়াবলি যেমন: মানবীয় আপেক্ষিক বিষয় ও নানা রোগ সম্পর্কে।

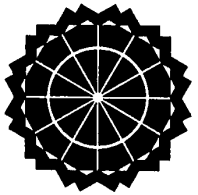

তৃতীয় অধ্যায়

সামঈয়্যাত (কুরআন-সুন্নাহ স্বীকৃত অন্যান্য আকিদা)

এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামী আকিদার ঐ বিষয়গুলো শামিল করবো যেগুলো আমরা শুনার মাধ্যমে জেনেছি, অর্থাৎ যেগুলো আমরা নির্ভরযোগ্য খবরের মাধ্যমে জেনেছি। তার মানে সেগুলো হয়ত কুরআনুল কারীমে উল্লেখ থাকবে অথবা পবিত্র সুন্নতে নববীতে। এ শ্রেণির বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত -মৃত্যুর পরবর্তী জীবনসংক্রান্ত বিষয়াবলি; যেমনঃ কবরের (বারযাখী) জীবনে মুমিনের জন্য নিয়ামত ও কাফের বা ফাসিক ব্যক্তির জন্য শাস্তির অবস্থা, হাশরের ময়দান, হিসাব-কিতাব, আমলনামা, মীযান (কর্মফল মাপকাঠি), হাউজে কাউসার, শাফাআত, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নামের চূড়ান্ত অবস্থা এবং এ জাতীয় অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়াবলি (গায়বিয়্যাত), যেগুলোর প্রতি ঈমান রাখা ফরজ এবং যেগুলোর সত্যতা আমরা কেবলমাত্র সহীহ ও বিশুদ্ধ শরয়ী দলীলসমূহ শ্রবণের মাধ্যমে লাভ করেছি।

সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

সাধারণভাবে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এরপর হবেন উলুল আয্‌ম নবীগণ যথাক্রমেঃ নূহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা আ.। এরপর অন্যান্য রাসূল, অতঃপর অন্যান্য নবী এরপর হলো ফেরেশতা আ.। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামগণের গ্রহণযোগ্য কথা।

কতক নবীকে কতক নবীর উপর প্রাধান্য দিতে কোন আপত্তি নেই। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [سورة البقرة:٢٥٣].

অর্থ:"এই রাসূলগণ- আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন"।

ইসরা এবং মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস

আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয়নবীকে রাতের আধারে জাগ্রত অবস্থায় রুহানী ও জিসমানীভাবে (১) বোরাকে চড়িয়ে মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়ে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা এটাও বিশ্বাস করি, জাগ্রত অবস্থায়- রূহ ও দেহের সহিত- কুদ্‌স শরীফ থেকে সাত আসমানের ঊর্ধ্বে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত জিবরাঈল عليه السلام এর সাথে এবং এরপর আল্লাহ তায়ালা যতদূর চেয়েছেন তত ঊর্ধ্বে তার মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে।

ইসরার ঘটনা কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الإسراء:١].

অর্থ:"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও পর্যবেক্ষণকারী"।

---

(১) অর্থাৎ শুধু রূহীভাবে না বরং রূহ ও সশরীরেই ভ্রমণ করিয়েছেন। [অনুবাদক]

আর মি'রাজ মুসলিমদের নিকট একটি ঐকমত্য বিষয়, যেহেতু এ ব্যাপারে প্রিয়নবী ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রচুর সহীহ বর্ণনা রয়েছে।

সাইয়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ﷺ সকল মানুষের আগে ইসরা এবং মিরাজের সত্যায়ন করেছেন। যার ফলেই তাকে "সিদ্দীক" লকব দেওয়া হয়, এছাড়া নবী করীম ﷺ কে সত্যগুণে গুণান্বিত করার ক্ষেত্রে আতিশয্যতা এবং তার বর্ণিত বাণীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণের ফলেও তাকে উক্ত লকব দেওয়া হয়।

মুনাফিকদের ছড়ানো দুর্নাম থেকে আম্মাজান সাইয়্যিদাহ আয়েশার (রা.) পবিত্রতা

মুনাফিকরা সাইয়্যিদাহ আয়েশা (রা.) কে যে অপবাদ দিয়েছে তা থেকে নিষ্কলুষতার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি কেউ কুরআনুল কারীমে তাঁর নির্দোষ হওয়ার বর্ণনা সম্পর্কে অবগত হয়েও এর বিপরীত বিশ্বাস রাখে তবে তা ব্যক্তিকে কুফুরীতে নিপতিত করবে। কেননা প্রকারান্তরে সে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ﴾ [سورة النور: ١١].

অর্থ:"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক"।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যারা

মুসলিম উম্মাহ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [سورة آل عمران: ١١٠].

অর্থ: "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"।

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহ সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ। যেহেতু তারা সমগ্র উম্মাহের উপর সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর উম্মাহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন সাহাবায়ে কেরাম, এরপর হলেন তাবেঈন। কেননা এ ব্যাপারে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেন: "আমার উম্মাতের মাঝে সর্বাধিক উত্তম তারাই যারা আমার যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ সাহাবীগণ)। তারপর তাদের সন্নিকটবর্তী লোকসকল (অর্থাৎ তাবি'ঈগণ)। তারপর তাদের সন্নিকটবর্তী লোকসকল (অর্থাৎ তাবি তাবি'ঈগণ)। (মুসলিম, ২৫৩৩)।

আর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবা হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন যথাক্রমে: আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং আলী ﷺ। তাদের মাঝে আবার শ্রেষ্ঠত্ব তাদের খিলাফতের পরিক্রমা অনুযায়ী।

মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের পরের স্তরের হলেন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অবশিষ্টগণ। তারা হলেন: ত্বলহা বিন ওবায়দুল্লাহ, যুবাইর বিন আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়েদ, আবু ওবায়দা আমের বিন যাররাহ ﷺ। এরপর পর্যায়ক্রমে বদরী সাহাবী, উহুদের সাহাবী এবং বাইয়াতে রিদওয়ানের অংশগ্রহণকারীরা।

সাহাবীদের মর্যাদা

নবীগণের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের প্রত্যেকেই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের সমালোচনা করা এবং খাটো করা জায়েয নেই। তারা উত্তমতার ঊর্ধ্বস্তরে অধিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [سورة التوبة: ١٠٠].

অর্থ:"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে অগ্রবর্তী, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা"।

আর মুস্তাহাব হলো কোন সাহাবীকে বাদ না দিয়ে সমস্ত সাহাবীর উপর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পড়া। তাদের কারো মর্যাদা খাটো করা বা কমানোর চেষ্টা করা জায়েয নেই।

সাহাবীদের মাঝে সংঘটিত মত পার্থক্যে একজন মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি

সাহাবীদের অনন্য ফযীলত থাকা সত্ত্বেও তারা মানুষ, মানবিক ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। আর তাদের মাঝে যেসকল বিবাদ এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের দ্বীন পালনে অধিক নিরাপদ হলো এগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করা। আমাদের জন্য যথেষ্ট হলো তাদের সবাইকে ভালোবাসা। আর আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, সাহাবাদের মাঝে সংঘটিত বিবাদ এবং যুদ্ধ

তাদের ইজতিহাদগত সিদ্ধান্ত ছিলো। সুতরাং যার ইজতিহাদ সঠিক ছিল তিনি দুটি ছওয়াবের অধিকারী হবেন। আর যার ইজতিহাদ সঠিক ছিল না তিনি একটি সওয়াবের অধিকারী হবেন।

প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে একজনের তাকলীদের বাধ্যবাধকতা

একজন মুকাল্লাফের জন্য আবশ্যক হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের আহকাম অনুযায়ী আমল করা। আর সঠিকভাবে আমল করতে তার জন্য আবশ্যক হলো উদ্দিষ্ট ইলম অর্জন করা। আর এজন্য মুজতাহিদ নন এমন মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো ফিকহী চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবের তাকলীদ করা; যাতে শরীয়তের হুকুমাবলির উপর আমল করতে সক্ষম হয়। আর যেসকল মাযহাবের অনুসরণ করা লাগবে সেগুলো হলো: হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী। ইমাম লাক্কানী (রহ.) বলেন:

"তাকলীদ করা ওয়াজিব, ইমামগণের ফতোয়া মোতাবেক,
এই কথা স্পষ্ট বলেছেন গ্রহনযোগ্য সকল উলামা মাশায়েখ"

আর আকিদার ক্ষেত্রে তাকলীদের অবৈধতার বিষয়টি পরিজ্ঞাত। বরং একজন মুকাল্লাফের জন্য আবশ্যক হচ্ছে পরিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিবিষ্ট করা যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় বিশুদ্ধ প্রমাণাদির মাধ্যমে লাভ করতে পারে, শুধু তাকলীদের মাধ্যমে নয়।

আকীদার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মাঝে সর্বজনস্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ দুইজন ইমাম সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁদের মাজহাবকে অনুসরণযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ দুই মহান ইমাম হলেন-ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী (রহ.) এবং ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদী (রহ.)। আর তাদের অনুসারীরা 'আশায়েরা' এবং 'মাতুরিদিয়্যাহ' নামে প্রসিদ্ধ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশই তারা। আকিদার বিষয়ে অনুসরণ (ইত্তিবা) কোনো অন্ধ অনুসরণ বা তাকলীদের মতো নয়; বরং এটি বিশুদ্ধ চিন্তাভাবনা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলীলভিত্তিক সমর্থনের মাধ্যমে সত্যের অনুসন্ধান। কারণ, ইত্তিবার মূল অর্থ-দলীল

জানার পর তা গ্রহণ ও সমর্থন করা; আর তাকলীদ হলো-দলীল জানা ছাড়াই কোনো মত বা ব্যক্তির অনুসরণ করা। আর তাসাউফ তরীকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইমাম হলেন: ইমাম জুনাইদ, ইমাম আব্দুল কাদের জিলানী, ইমাম আহমদ রিফাঈ, ইমাম আবুল হাসান শাযেলী -রহিমাহুমুল্লাহ- (১)

একজন মুকাল্লাফ মুসলিমের জন্য সব অবস্থায় এটা জরুরি যে, দ্বীনের কোনো বিষয় তার অজানা থাকলে তিনি চার মাযহাবের এমন বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া -যাঁরা তাকওয়া, আল্লাহভীতি, দ্বীনি দায়িত্ববোধ এবং গভীর জ্ঞানে প্রসিদ্ধ। কারণ, একজন সাধারণ মুসলিম সবসময় সঠিক মাসআলা জানেন না; কেননা তিনি সে স্তরের নন, যাঁরা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বিশ্লেষণ ও নির্ণয় করার যোগ্যতা রাখেন। তাই তার করণীয় হলো-যাঁরা দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও আল্লাহভীতির অধিকারী, এমন নির্ভরযোগ্য আলেমদের জিজ্ঞাসা করা এবং তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলা। ফলে আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর উপরই আমল হবে:

﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ [سورة النحل:٤٣].

অর্থ: "অতএব তোমরা যদি না জানো তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর"।

ওলীর তাৎপর্য ও সৎকর্মশীল ওলীদের মর্যাদা

وليّ শব্দটি ولاية শব্দ থেকে উৎকলিত যা নৈকট্য, পছন্দ এবং অনন্যতার অর্থ ব্যক্ত করে। ওলী হলেন তিনি যিনি আল্লাহ তায়ালার

(১) এখানে মধ্যপ্রাচ্যে যাদের ত্বরিকা বেশি প্রসিদ্ধ তাদের কথা বলা হয়েছে। আর মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ায় যারা বেশি প্রসিদ্ধ তারা হলেন: সুলতানুল হিন্দ খাজা মুইন উদ্দিন চিশতী রহ., ইমাম খাজা বাহাউদ্দিন নকশাবন্দী রহ., ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (মুজাদ্দিদে আলফে সানী) রহ. প্রমুখ। [অনুবাদক]

ইবাদতগুলোকে বাহ্যিকভাবে সুচারুরূপে সম্পাদন করেন এবং যার হৃদয় আন্তরিকতার সাথে ঈমান ও তাকওয়াকে ধারন করে। এর ফলস্বরূপ, আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, তাকে গোনাহ ও পথভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখেন এবং তাঁর জিকির ও সৃষ্টির উপর গভীর চিন্তা-মুরাকাবার পথে স্থিরতা ও দৃঢ়তা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾﴾ [سورة يونس:٦٢-٦٤].

অর্থ: "মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তিত হবেন। তারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা"।

ইমাম সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (রহ.) ওলীর পরিচয়ে বলেন: "ওলী হলেন তিনি যিনি আল্লাহ তায়ালা এবং তার গুণাবলি সম্পর্কে অবগত, নেক কাজে সদা অবিচল, পাপ থেকে সদা বিরত এবং ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির প্রতি নিবিষ্টতা পরিহারকারী"। (১)

ওলীদের কারামত

আর কারামাতের ক্ষেত্রে বলতে গেলে সবচেয়ে বড় কারামত হলো, সত্যের উপর অবিচল থাকা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও অন্তরের পাপ থেকে বিরত থাকা, এবং এ জাতীয় কাজ একেবারেই সংঘটিত না হওয়া। বস্তুত

(১) তাফতাযানী, সাদ উদ্দীন মাসউদ ইবনে ওমর, (মৃ: ৭৯৩ হিঃ), *শরহুল মাকাসেদ ফি ইলমিল কালাম,* (পাকিস্তান: দারুল মায়ারিফ আন-নুমানিয়্যাহ, ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১) খ. ২, পৃ. ২০৩।

এটা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। খুব কম মানুষই এভাবে চলার তৌফিক পায়। আর যারা পায় তারাই হলেন আল্লাহর প্রিয় বন্ধু তথা ওলী।

আর অলৌকিক ঘটনা অর্থে কারামাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কাছে একটি বিধিসম্মত বিষয়। এটা এমন প্রতিষ্ঠিত বিষয় যা প্রত্যাখ্যানের সুযোগ নেই। শুধু তাই না বিষয়টি বহুজন থেকে সহীহ ও মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত। যেমন, মারইয়াম আ. এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [سورة آل عمران:٣٧].

অর্থ: "যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞাসা করতেন: "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন: "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন"।

অনেক উলামায়ে কেরাম এই রিযিককে তাফসীর করেছেন এমন এক বিশেষ দান হিসেবে, যা আল্লাহ তাআলা মারইয়াম (আ.)-এর জন্য কোনো প্রচেষ্টা বা কারো সাহায্য ছাড়াই পাঠাতেন। এটি ছিল একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে খালেস রিযিক-এমনকি শীতকালে তার নিকট উপস্থিত হতো গ্রীষ্মকালীন ফল! এজন্যই সায়্যিদুনা যাকারিয়া ﷺ খুব কৌতূহলের সাথে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তাছাড়া সাহাবীদের থেকেও অনেক কারামাত সংঘটিত হয়েছে। এই যেমন ওমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ মদিনা মুনাওয়ারা থেকে অনেক দূরবর্তী এক সৈন্যদলকে ডাক দিয়েছিলেন, বহুদূর হওয়া সত্ত্বেও সেনাপতি হযরত ওমর ﷺ এর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। এ ঘটনা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) এর *ফাদায়িলুস সাহাবা* কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা হযরত ওমর ﷺ একদল সৈন্যবাহিনী

প্রেরণ করলেন। তাদের আমীর বানালেন এমন ব্যক্তিকে যাকে সারিয়াহ নামে ডাকা হয়। তিনি (আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা:) বলেন: একদা খলিফা ওমর মানুষদের সম্মুখে খুতবা দিচ্ছিলেন। তো তিনি মিম্বারে দাড়ানো অবস্থায় চিৎকার করে বললেন,"হে সারিয়াহ, পাহাড়! হে সারিয়াহ, পাহাড়! পরবর্তীতে সেনাপতির দূত আসলো ও বললো: হে আমিরুল মুমিনীন! আমরা শত্রুর মুখামুখি হই এবং তারা আমাদের প্রায় পরাজিত করেই ফেলে। অতপর হঠাৎ একজন আওয়াজকারীর আওয়াজ আসলো: "হে সারিয়াহ, পাহাড়! হে সারিয়াহ, পাহাড়!" ফলে আমরা পাহাড়ের ঢালে আশ্রয় নিলাম আর আল্লাহ তায়ালা তাদের পরাজিত করলেন।

ইসলামে দোয়ার গুরুত্ব এবং বান্দার জীবনে এর প্রভাব

দোয়া এমন ইবাদত যার ফলে ব্যক্তি সওয়াব প্রাপ্ত হয়। সাধারণভাবে দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল বা গৃহীত হয় যদি দোয়ার কবুলের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে। ইসতিজাবাহ বা কবুল কয়েক ধরনের হয়ে থাকে:

১. বান্দা যা চাইবে সেটাই দেয়া হবে অথবা তার চেয়ে ভালোটা দেয়া হবে।

২. সে যা চেয়েছে তার মুকাবেলায় অনুরূপ অথবা তার চেয়ে মারাত্মক অনিষ্ট দূর করে দেওয়া হবে।

৩. দোয়ার প্রতিদান সঞ্চয় করে রাখা হবে আর তার পুরস্কার আখিরাতে দেয়া হবে।

সে যাই হোক একজন মুসলিমের উচিত হচ্ছে দোয়ায় লেগে থাকা। কেননা এটা রূহের শক্তি, ক্ষতের প্রতিষেধক, এর মাধ্যমেই কামনা-বাসনা আর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। এ কারণেই বর্ণিত হয়েছে যে নবী কারীম ﷺ বলেছেন,"দোয়া হলো ইবাদতের মগজ" (তিরমীযি, ৩৩৭১)। দোয়া হলো বান্দার জন্য তার প্রভুর প্রতি দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর সম্মুখে এটাইতো তার সম্মান মর্যাদা। শুধু তাই না, দোয়া বান্দাকে মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে ফিরিয়ে রাখে।

যেসকল বাক্য দিয়ে বান্দা তার প্রভুর কাছে দোয়া করবে তা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে এমন কোন ধরাবাঁধা দোয়ার বাক্য নেই যা একজন মুমিনের বাধ্যতামূলক করতেই হবে। তবে এক্ষেত্রে কিছু বাক্য আছে যা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ভাষায় কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে। আবার কিছু আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; যেমনটা ইমাম নববীর (রহ:) ***কিতাবুল আযকারে*** আছে। আবার কিছু আছে আওলিয়া এবং সালেহীনদের বাণীতে যেমনটা বিদ্যমান দৈনন্দিন আমল ও জিকিরের অযীফার কিতাবে। আর কিছু আছে এমন যা প্রত্যেক মুসলিম তার সক্ষমতা, সামর্থ্য ও জ্ঞান অনুযায়ী বলতে পারে। মোটকথা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের দোয়া করতে ব্যাপক পরিসরে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾ [سورة البقرة:١٨٦].

অর্থ: "আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে"।

রুহের মর্মকথা

রূহের অস্তিত্বে ঈমান রাখা আবশ্যক, কেননা কুরআনুল কারীম এবং সহীহ সুন্নাহর মাধ্যমে এর সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তবে রূহের প্রকৃত রহস্য বা হাকীকত কী, সেটি আমরা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের নিকট সোপর্দ করি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [سورة الإسراء: ٨٥].

অর্থ: "তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

কবরে দুই ফেরেশতার জিজ্ঞাসাবাদের উপর ঈমান আনার হুকুম

মানুষকে দাফনের পর কবরে মুনকার-নাকিরের জিজ্ঞাসাবাদের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। কেননা এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যেমন হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেন: "মৃত লোককে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয় তখন কালো বর্ণের এবং নীল চোখ বিশিষ্ট দু'জন ফেরেশতা আসেন তার নিকট। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার এবং অন্যজনকে নাকীর বলা হয়। তারা উভয়ে (মৃত ব্যক্তিকে) প্রশ্ন করেন: তুমি এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) প্রসঙ্গে কি বলতে? মৃত ব্যক্তিটি (যদি মুমিন হয় তাহলে) পূর্বে যা বলত তাই বলবে: তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারা উভয়ে তখন বলবেন, আমরা তো জানতাম তুমি এ কথাই বলবে। তারপর সে ব্যক্তির কবর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সত্তর হাত করে প্রশস্ত করা হবে এবং তার জন্য এখানে আলোর ব্যবস্থা করা হবে। তারপর সে লোককে বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সে বলবে, আমার পরিবার-পরিজনকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আমি তাদের নিকট ফিরে যেতে চাই। তারা উভয়ে বলবে, বাসর ঘরের বরের মতো তুমি এখানে এমন গভীর ঘুম দাও, যাকে তার পরিবারের সবচাইতে প্রিয়জন ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে তার বিছানা হতে জাগিয়ে তুলবেন।

কিন্তু মৃত লোকটি যদি মুনাফিক হয় তাহলে (প্রশ্নের উত্তরে) বলবে, তার (রাসূল সা.) প্রসঙ্গে লোকেরা একটা কথা বলত আমিও তাই বলতাম। এর বেশি কিছুই আমি জানি না। ফেরেশতা দুজন তখন বলবেন, আমরা জানতাম, এ কথাই তুমি বলবে। তারপর জমিনকে বলা হবে, একে চাপ দাও। সে লোককে এমন শক্ত করে জমিন চাপা দেবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো পরস্পরের মাঝে ঢুকে পড়বে। (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাকে তার এ বিছানা হতে উঠানো পর্যন্ত সে লোক এভাবেই আযাব পেতে থাকবে। (সুনানে তিরমীযি, ১০৭১)।

কবরের আযাব ও নিয়ামত

একজন মুমিনের জন্য এ বিশ্বাস রাখা জরুরি যে, কবর হচ্ছে মৃত্যুর পরের জীবনের প্রথম ধাপ, যাকে বারযাখ বলা হয়। সেখানে মানুষ মৃত্যুর পর অবস্থান করে। মুমিনদের আরও বিশ্বাস রাখা দরকার যে, কবরের জীবনে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা নানা নিয়ামতে থাকেন, আর যারা কুফরি করে ও পাপের পথে চলে, তারা সেখানে শাস্তির মুখোমুখি হন। কবরের আযাবের সত্যতার দলীল হলো আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী:

﴿ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ ٱلۡعَذَابِ ۝٤٥ ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ۝٤٦ ﴾

[سورة غافر: ٤٥-٤٦].

অর্থ: "এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল করো"।

আর যখন কাফেরদের কবরে আযাব দেওয়া বিধিসম্মত প্রমাণিত হলো তখন তো মুমিনদেরকে নিয়ামত প্রদানও প্রমাণিত।

একজন মুসলিমের জন্য কর্তব্য হলো ভালো কাজে খুব বেশি আগুয়ান হওয়া যাতে কবরের ভয়াবহ আযাব থেকে বাচাঁ যায়। আর সকল নেক আমলের মূল হলো, আল্লাহ তায়ালা, তার ফেরেশতা, তার প্রেরিত কিতাব, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস, তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনা। যেসকল কর্মাবলি তার উপর আবশ্যক করা হয়েছে যেমন: নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি আদায় করা ও অন্যান্য আবশ্যিক কর্মাবলি সম্পাদন করা। কেননা এ সকল বিষয়ে ঢিলেমি বা বিলম্বকরণ শাস্তি ও কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি করে।

কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থান ও পরবর্তী অদৃশ্য বিষয়গুলোতে ঈমান আনার আবশ্যকতা

অদৃশ্য জগতের যেসব বিষয় কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, কিয়ামতের দিন সে সব কিছু ঘটবে-এই বিশ্বাস রাখা একজন মুমিনের জন্য ফরজ। এসব বিষয় এমন গায়েবী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতি বিশ্বাসই মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং তাকে প্রশংসার উপযুক্ত করে তোলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ﴾ [سورة البقرة:٢-٣].

অর্থ: "এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে..."।

বস্তুত কুরআন-সুন্নাহতে যা বর্ণিত হয়েছে সে সমস্ত বিষয়ের উপর নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি দেয়া ঈমানের মূল পুঁজি। এটাই তার ঈমানের প্রমাণ। যেমন জান্নাত অদৃশ্য বিষয়, জাহান্নাম অদৃশ্য এবং কিয়ামত দিবসের সবই অদৃশ্য।

এখানে একজন মুকাল্লাফের আরেকটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার, সেটা হলো আমরা এ অধ্যায়ে সামইয়্যাত তথা কুরআন-সুন্নাহ স্বীকৃত

যেসকল বিষয় অর্ন্তভূক্ত করেছি সেগুলো সাব্যস্ত অথবা নাকচ করার ক্ষেত্রে মানবীয় বিবেক (আক্‌ল) ও বিবেক প্রসূত প্রমাণাদির (দলীলে আকলীর) কোন স্থান নেই। বস্তুত এখানে আকলের কাজ ঐ অদৃশ্য বিষয়টির সম্ভাব্যতা সাব্যস্তের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন আক্‌ল- কবরের আযাব, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব, পুলসিরাতের সম্ভাব্যতা এবং জান্নাত জাহান্নামের অস্তিত্বের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে হুকুম দিবে। অতঃপর এটার বাস্তবতা ও সংঘটিত হওয়ার বিষয়াবলি শরীয়ত প্রণেতা তথা আল্লাহ-রাসূলের বাণী থেকে গ্রহণ করা হবে।

কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত সে রকমই কিছু অদৃশ্য বিষয়াবলি যেগুলোর উপর ঈমান আনা আবশ্যক:

পুনরুত্থান: এটা হলো মৃতদের জীবিত করা এবং মৃত্যু পরবর্তী তাদের কবর থেকে উত্থিত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ﴾ [سورة الحج:٥].

অর্থ: "হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ-) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে- তোমাদের কাছে (তোমাদের) প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার জন্য।"

হাশর: তা হলো কবর থেকে উঠার পর সমস্ত মানুষকে বিচারের আওতায় আনার জন্য একত্রিত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿۞وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٠٣﴾ [سورة البقرة:٢٠٣].

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমাদের সবাইকে তার সামনে সমবেত করা হবে"।

তিনি আরোও বলেন:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [سورة المؤمنون:٧٩].

অর্থ: "তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে"।

হিসাব: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হাশরের ময়দান থেকে বান্দাদের প্রস্থানের পূর্বে দাঁড় করিয়ে দিবেন তাদের কথা, কাজ ও আকিদা-বিশ্বাসের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٧﴾﴾ [سورة غافر:٢٧].

অর্থ: "মূসা বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি"।

- কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। অনুরূপভাবে কিয়ামত নিকটবর্তী কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত আলামতের উপরও বিশ্বাস রাখতে হবে।
- বান্দাদের আমলনামা গ্রহণের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। নেক আমল বা বদআমলের ওজন করার ব্যাপারে বিশ্বাস করতে হবে। অনুরূপভাবে ঐ দাড়িপাল্লার অস্তিত্বের ব্যাপারে ঈমান রাখতে হবে যা দিয়ে কিয়ামতের দিন আমল মাপা হবে।
- আরো ঈমান রাখা আবশ্যক যথাক্রমে: পুলসিরাত, আরশ, কুরসী, কলম, লাওহে মাহফুজ এবং বান্দাদের আমলনামা সংকলনকারী ফেরেশতাদের উপর। সাথে সাথে এ সমস্ত কিছুর হাকীকত আল্লাহ তায়ালার দিকে ন্যাস্ত করা হবে।
- জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বের উপর ঈমান আনতে হবে এবং উভয়টি বর্তমানে সৃষ্ট, এগুলোর কোনটি ধ্বংসও হবে না, নিঃশেষও হবে না। আল্লাহ তায়ালা উভয় স্থানের জন্যই বাসিন্দা সৃষ্টি করে রেখেছেন।

- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওযে কাউছার এবং তার শাফায়াতের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

তওবা ব্যতীত পাপে নিমগ্ন থাকার হুকুম

নিঃসন্দেহে, কোনো ব্যক্তি যদি গুরুতর পাপে লিপ্তও হয়, তবুও তাকে কুফরির ফতোয়া দেওয়া যায় না-যতক্ষণ না সে সেই পাপকে হালাল মনে করে, অথবা সেই পাপ এমন প্রকৃতির না হয় যা স্বয়ং ইমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন- কুরআন মাজীদকে অবমাননা করা।

যে তাওবা ছাড়া ঈমানের উপর মারা যায় তার ফয়সালা আমরা আল্লাহর নিকট ন্যস্ত করি। আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, সে শাস্তি পাবে নাকি মাফ পাবে। তবে আমরা এটুকু বিশ্বাস করি যে, কোনো মুমিন তার পাপের কারণে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।

প্রত্যেক পাপ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাওবা করা জরুরি। তাওবা এভাবে করতে হবে যে-সব পাপ কাজ ছেড়ে দিতে হবে, নিজের ভুলের জন্য সত্যিকারের অনুতপ্ত হতে হবে, এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে, ভবিষ্যতে আর সেই পাপ করবে না। যদি সেই পাপে অন্য কারো হক নষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

এই তৃতীয় অধ্যায়ে যা আলোচিত হলো সেগুলো সামইয়্যাতের এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি যা একজন মুকাল্লাফের অবগত হওয়া আবশ্যক। আর প্রত্যেকটি বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহে বিস্তারিত দলীল বিদ্যমান।

পরিশিষ্ট

গুরত্বপূর্ণ কিছু ফিকহী মাসয়ালার বর্ণনা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট আলেমদের জীবনী

এই কিতাবের পরিশিষ্ট অংশে আমরা কিছু ফিকহী মাসআলার আলোচনা করব, যেগুলো নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক ও বাড়াবাড়ি কিছু লোকের কথাবার্তায় সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে-যদিও সেগুলো শরীয়তের মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিভ্রান্তির মূল কারণ হলো, তারা এসব মাসআলাকে আকীদার অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং কেউ ভিন্ন মত পোষণ করলে তাকে কুফরির ফতোয়া দেয়। অথচ এটি স্পষ্ট ভ্রান্তি এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থানের সরাসরি লঙ্ঘন।

অতএব, এই পরিশিষ্ট অংশে আমাদের উদ্দেশ্য হলো-এসব মাসআলার প্রকৃত অবস্থান স্পষ্ট করা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত গ্রহণযোগ্য চার মাযহাবের ফিকহী মানদণ্ড অনুযায়ী সেগুলোর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা তুলে ধরা। একইসাথে আমরা এটাও পরিষ্কারভাবে বলব: এসব ইখতিলাফ মূলত হালাল-হারাম পর্যায়ের মতবিরোধ, ঈমান-কুফরের নয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বহু প্রখ্যাত ইমামও এই নীতি অনুসরণ করেছেন। যেমন, তারা "ইমামাতুল উজমা"র মতো একটি ফিকহী মাসআলাকে আকিদার গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন, কারণ তাদের সময়ে বিরোধীরা একে দ্বীনের মূল বিশ্বাস হিসেবে তুলে ধরে, এর অস্বীকৃতিকারীকে কাফের আখ্যা দিত। [সেই বিভ্রান্তি দূর করতেই ইমামগণ তা আকিদার আলোচনায়

এনেছেন, যেন স্পষ্ট হয়ে যায়-এসব মতভেদ দ্বীন থেকে বের করে দেওয়ার কারণ নয়, বরং ফিকহী ব্যাখ্যার অংশ।]

আল্লাহর নিকট আমরা প্রার্থনা করি কোন বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ব্যতীতই এসকল মাসয়ালার মৌলিক তাৎপর্যের একটি সুস্পষ্ট জ্ঞান অবহিত হয়। (আমিন)।

প্রথম: মুসলিমদের তাকফীর করার হুকুম:

এটা জানা উচিত, মুসলিমদের তাকফীর করা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাকে কুফরির ফতোয়া দেওয়া কোনোভাবেই বৈধ নয়। নবী কারীম ﷺ বিদায় হজের ভাষণে কাউকে তাকফীর করার ভয়াবহতা এবং এর ফলে যে দলবিভক্তি ও খুনাখুনির সৃষ্টি হয় সে ব্যাপারে আমাদের সাবধান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও সম্মানকে শারী'আতের হক ব্যতীত এমন পবিত্র করে দিয়েছেন, যেমন পবিত্র তোমাদের এ মাসে এ শহরের মাঝে আজকের এ দিনটি। ওহে! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? এ প্রশ্নটি তিনি তিনবার করলেন। প্রত্যেকবারেই তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্বংস! তোমরা আমার পরে একে অপরের গর্দান মেরে কাফের হয়ে পেছনের দিকে ফিরে যেও না।" (সহীহ বুখারী, ৪৪০২)।

ইসলাম একজন মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জতের নিরাপত্তার হুকুম দিয়েছে এবং যে কালিমায়ে শাহাদাত পড়েছে ও ইসলামী আহকামগুলো পালন করেছে তাকে মুসলিম স্বীকৃতি দিয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে বিশ্বাসঘাতকতা করো না"। (সহীহ বুখারী, ৩৯১)।

দ্বিতীয়: কাফেরকে তাকফীর না করার হুকুম:

ঈমানের প্রকৃত অর্থ হলো-আন্তরিকভাবে এই সাক্ষ্যকে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি দেওয়া: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এই সত্যায়নের দাবি হলো-তাওহীদের পরিপন্থী সবকিছু থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা এবং তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা। অপরদিকে কুফুর হলো মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, অস্বীকার করা বা কুফুরীতে সন্তোষ প্রকাশ করা অথবা একত্ববাদের শাহাদাহ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" তে পরিপূর্ণ অজ্ঞ থাকা। অতএব, একজন মুমিন সেই ব্যক্তি, যিনি এই একত্ববাদের সাক্ষ্যকে অন্তর থেকে পূর্ণ বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং তা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন। এর ফলে, তিনি আল্লাহর দরবারে একজন সফল, মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে পরিগণিত হন।

মুমিন সেই ব্যক্তি, যিনি আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য দেন-আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তিনি দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়গুলোকে এমনভাবে বিশ্বাস করেন যে, যখনই বুঝতে পারেন এটি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখনই তা স্বীকৃতি দেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন।

একজন মুমিনের জন্য এর অতিরিক্ত কিছু আবশ্যক নয়-যেমন, তাকফীর সম্পর্কিত জটিল মাসআলায় গভীর অনুসন্ধান করা, বা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বা কোনো গোষ্ঠীকে কাফের ঘোষণা করা। এখন ধরুন, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর প্রতি বিশ্বাস রেখে সে অনুযায়ী জীবনযাপন করেন এবং সেই ঈমানের উপরই তার মৃত্যু হয় কিন্তু কারো কুফুরী উপলব্ধি না করার কারণে কাউকে তাকফীর করেনি অথবা এটা যে কুফুরী হতে পারে এ চিন্তাই তার মাথায় আসেনি কিংবা সে কোনদিন কারো ব্যাপারে কাফের শব্দ বলেনি তবুও সে একজন প্রকৃত মুমিন এবং আল্লাহর কাছে মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা হিসেবে গণ্য হবে।

যে ব্যক্তি ঐসকল কাফেরদের কুফুরীতে সন্তুষ্ট থাকে, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কুফরের ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু সে তাদের কাফের হুকুম

দিতে দ্বিধাবোধ করে বা এ সত্য জানার পরও তাদের কাফের বলা থেকে বিরত থাকে, তার জন্য মুমিন হওয়ার দাবি করা যৌক্তিক নয়। কেননা এর মাধ্যমে সে আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুমের মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী সাব্যস্ত হয়েছে, কুফুরের প্রতি তার সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। আর এ অবস্থায় ঈমানের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

এই কিতাবে আমরা এই মাসয়ালা উল্লেখ করেছি, কারণ কিছু গোষ্ঠী প্রায়শই কাউকে তাকফীর করে থাকে, তা সে প্রকৃতপক্ষে কাফের হোক বা না হোক। অতপর দাবী করতে থাকে, যে ব্যক্তি অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলবে না সেও কাফের হবে এ দলীলে, 'যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের বলে না সেও কাফের'। এ ধরনের ভ্রান্তি ও অতিশয়োক্তি দূর করার উদ্দেশ্যেই আমরা এই মাসয়ালা উপস্থাপন করেছি। এক্ষেত্রে, একজন মুসলিম মুকাল্লাফকে এটি জানতে হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাউকে কাফের বলার কাজটি কোনোভাবেই প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আবশ্যক নয়। বরং এটি তাদের কর্তব্য, যারা ফিকহের গভীর জ্ঞান, শরয়ী মাসায়েলের প্রকৃত মর্ম ও পরিধি সম্পর্কে অবহিত।

তৃতীয়: আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জবাই করা:

কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির সম্মানে বা তা'যীমে অথবা শ্রদ্ধায় পশু জবেহ করে। আহলে ফিকহের কাছে এর হুকুম কী?

সত্য কথা হলো এ কারণে কাফের বলা যাবে না যদি না আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্যে জবেহের ক্ষেত্রে কোন কুফুরী বিষয় থাকে। যেমন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে গাইরুল্লার ইবাদত বা জবেহের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেবতাসরূপ তা'জীম করা এবং প্রভুত্বের গুণাবলি তার মাঝে আছে বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি। ফকীহ ইমামগণ এ মতই অবলম্বন করেছেন।

ইমাম রাফেয়ী আশ-শাফেয়ী (রহ:) বলেন: "যদি কোন মুসলিম কাবাকে বা রাসূল ﷺ এর তা'জীমের উদ্দেশ্যে জবাই করে তাহলে তাকে

হারাম বলাই সুদৃঢ়। কেননা সে আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্যে জবাই করেছে" (১)। অনুরূপ মত ইমাম নববী (রহঃ) এরও (২)।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, "জেনে রাখুন, প্রভুর জন্য জবাই করা বা তার নামে জবেহ করা কেমন যেন তার জন্য সিজদাহ করার নামান্তর। এর প্রত্যেকটিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়লার তা'জীম ও ইবাদতের একেকটি ধরন, আর একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য।

সুতরাং, কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য, যেমন কোনো প্রাণী বা পাথরের মূর্তির জন্য জবাই করে ইবাদত ও তা'জীমের নিয়তে, তবে তার সেই জবাই বৈধ নয়, বরং এটি কুফরি কাজ। এটি ঠিক এমন, যেমন কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদতের সেজদা করে। একইভাবে, কেউ যদি আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকেও একই উদ্দেশ্যে জবাইয়ে শরিক করে, তাহলেও তা কুফরি গণ্য হবে।

তবে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য জবাই করে, কিন্তু তা ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়- যেমন, কাবাঘরকে সম্মান জানিয়ে জবাই করা, কেননা এটি আল্লাহর ঘর, বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে জবাই করা, কারণ তিনি আল্লাহর রাসুল-তাহলে এর দ্বারা জবাই হারাম হয়ে যায় না।

আর এ তাৎপর্যতেই আবর্তিত হয় ঐ ব্যক্তির কথা যিনি বলেন: "আমি হেরেম শরীফের উদ্দেশ্যে জবাই করলাম" বা "কাবার জন্য জবাই করলাম"। এমনকি কেউ যদি কোনো বাদশাহ বা শাসকের আগমনে খুশি হয়ে জবাই করে, তাহলে সেটি সন্তুষ্টি প্রকাশের নিদর্শন হিসেবে হয়, যেমন নবজাতকের জন্মে আক্বীকা করা হয়। এই ধরনের কাজ কুফরি নয়।

---

(১) আর-রাফেঈ, আবুল কাসেম আব্দুল করীম ইবনু মুহাম্মদ আল-কাযবিনী (মৃ. ৬২৩ হি.), *আল-আযীয শরহুল ওয়াযীয,* (বৈরুত: দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, ১৪১৭হি.), ১ম সংস্করণ, তাহকীক: আলী এওয়াদ ও আদেল আব্দুল মাওযুদ, খ.১২ পৃ.৮৪।

(২) নববী, আবু যাকারিয়া মহীউদ্দীন ইবনে শরফ (মৃ: ৬৭৬ হিঃ), *রওদাতুত ত্বলেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন,* (বৈরুত: মাকতাবুল ইসলাম, ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ১৯৯১ সাল), তৃতীয় সংস্করণ, তাহকীক: জুহাইর শাউইশ, খ.৩, পৃ.২০৫।

অনুরূপভাবে, কাউকে বিনয়ের প্রকাশস্বরূপ বা শ্রদ্ধাবশত সেজদা করলেও তা কুফরি নয়।"(১)

এসকল আহকামের মূলভিত্তি হলো: ঈমান বস্তুত অন্তর থেকে সত্যায়ন আর কুফুর হলো তা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। আর নিশ্চয় একজন মুসলিম কোন পাপ বা অপরাধের কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হন না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাসকে নাকচ করে এমন আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতীত কোন কিছু তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না।

এই সর্বোৎকৃষ্ট তরীকায় একজন মুকাল্লাফ তার আক্বীদায়, আমলে, মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে, তাদের কর্মাবলি ও তাদের আচরণ উপলব্ধিকরণে দূরদর্শী হবে। স্পষ্ট প্রমাণাদির উপর বিদ্যমান থাকবে, ফলে অন্যায়ভাবে তাকফীর করাতে প্রবৃত্ত হবে না।

চতুর্থ: কবরে তাওয়াফ করা:

প্রথমত এটা জানা আবশ্যক মুসলিমরা মৌলিকভাবে একত্ববাদী। প্রাথমিকভাবে এই ধারণা করা বৈধ হবে না যে তারা আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন সত্তার ইবাদত করে। এখন যদি কারো কাছ থেকে শরীয়তের বিরোধী কর্ম অথবা প্রবৃত্তি তাড়িত কোন অপরাধ অথবা কোন সংশয় বা মূর্খতা প্রকাশিত হয় তাহলে আমাদের উচিত হলো বিষয়টি বিশ্লেষণ করা, তাদেরকে কাফের বা বিদয়াতী সাব্যস্তে তাড়াহুড়া না করা।

আমরা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করেছি যেটা অনেকটা কবরকে তাওয়াফ করার মতো, প্রকৃতপক্ষে সেটা যিয়ারতে একধরনের শৃঙ্খলার জন্য হয়ে থাকে। তবে কিছু নির্দিষ্ট স্থানে মানুষ এরকম কার্যে অভ্যস্ত যেমন,

---

(১) নববী, *রওদাতুত ত্বলেবীন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২০৫-২০৬।
এখানে বলে রাখা ভালো, ইসলামী শরীয়ার বিধি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে বিণয়াবশত সিজদা করা হারাম এবং কবিরা গুনাহ, যদিও কুফুর ও শির্ক না হয়। আর উপরে জবেহ সংশ্লিষ্ট মাসয়ালার অবতারনা করা হয়েছে বস্তুত এটাকে কেন্দ্র করে যারা কুফুর শির্কের ফতোয়া দেয় তা মোকাবেলা করার জন্য, নিয়ত ঠিক রেখে অন্য কিছুর নামে জবেহের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য নয়। স্বাভাবিকভাবে জবেহ হবে একমাত্র আল্লাহর নামে। [অনুবাদক]।

কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা। সুতরাং ফুকাহাদের কাছে এর হুকুম কি, তা বর্ণনা করা আবশ্যক।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতামত তালাশ করলে দেখতে পাই, এর হুকুম হারাম ও মাকরূহের মাঝে সীমাবদ্ধ। হাম্বলীদের কাছে এটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে মাকরূহ। আর অধিকাংশের নিকট হারাম। কিন্তু কেউই তাকফীরের কথা বলেননি। কেননা এটা পরিজ্ঞাত যে, এটি একটি ফিকহী মাসয়ালা; আকিদাগত নয়। কাজেই তাকফীরের হুকুম দেওয়া যাবে না যদি না আকিদাগত কোন কুফুরী এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। যেমন সে মৃতব্যক্তির কবর তাওয়াফ করে তার ইবাদতসরূপ অথবা আল্লাহ তায়ালার সত্তা বা তার প্রভুত্বের কোন গুণাবলির সাথে অংশিদারিত্বে বিশ্বাস রেখে তাওয়াফ করে। বাস্তব কথা হলো, একজন মুসলিমের চিন্তায় এগুলো উদয়ও হয় না।

কবরকেন্দ্রিক তাওয়াফের হুকুম সম্পর্কে ফিকহী মাযহাব সমূহের কিছু বর্ণনা:

ইবনু নাকীব আশ-শাফেয়ী রহ. বলেন: "কবর কেন্দ্রিক তওয়াফ জায়েয নেই। কবরের সাথে পিঠ, পেট লাগানো মাকরূহ। তাছাড়া কবরকে চুম্বন বা স্পর্শ করতে যাবে না"(১)

ফকীহ হাযাবি আল-হাম্বলি রহ. বলেন: "আর মাকরূহ হলো: কবরের কাছে রাত্রি যাপন করা, কবরে চুনা লাগানো, কারুকাজ করা, কবর প্লাস্টার করা, কবরকে চুম্বন করা, কবর তাওয়াফ করা, কবরে ধূপ দেওয়া, ফলকে লিখা এবং তা গর্তে বসানো, কবরের মাটি দিয়ে রোগমুক্তি কামনা করা, কবরের উপর লেখালেখি করা, এর উপর বসা, হাঁটাচলা করা। তবে কেউ বলেছেন: প্রয়োজন হলে তা ভিন্ন কথা। কবরের ঠেস দেয়া ইত্যাদি..."(২)

---

(১) ইবনু নাকীব, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে লুআ'লুই (মৃ: ৭৬৯ হিঃ), *উমদাতুস সালেক ওয়া উদ্দাতুন নাসেক,* (কাতার: শুয়ুনি দ্বিনিয়াহ, ১৯৮২ সাল), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৪৫।

(২) আল-হিযাভী, মুসা ইবনে আহমদ সালেহী, (মৃ:৯৬৮ হিঃ), *আল-ইকনা ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল,* (বৈরুত, লেবানন: দারুল মারেফাহ), তাহকীক: আব্দুল লতিফ সুবকী, খ. ১, পৃ. ২৩৩।

শায়েখ মারঈ আল-হাম্বলী বলেন: "আর মাকরূহ হচ্ছে কবরে কারুকাজ করা, প্লাস্টার করা, ধূপ দ্বারা সুবাসিত করা, চুম্বন করা, কবরকে তাওয়াফ করা ও এর উপর ঠেস দেয়া"(১)

এ সমস্ত বর্ণনা এ মাসয়ালায় কুফুরের হুকুম উল্লেখ করেনি বরং হারাম অথবা মাকরূহের হুকুম উল্লেখ করেছে।

পঞ্চম: আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন নামে হলফ করা

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন নামে শপথ করে তাকে কাফের বলা জায়েয নেই। বেশির চেয়ে বেশি এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। আর এটাই ফকীহ ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নববী রহ. বলেন: "কোন সৃষ্টির নামে হলফ করা মাকরূহ, যেমন: নবী, কাবা, জিবরাঈল, সাহাবা ও আহলে বাইতের নামে হলফ করা।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন: আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ভিন্ন নামে হলফ করা অপরাধ হওয়ার আশঙ্কা করছি, তার ছাত্ররা বলেন: অর্থাৎ হারাম ও পাপ হওয়ার আশঙ্কা। তার মানে ইমাম শাফেয়ী এর হুকুমের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইমাম বলেন: অকাট্য মত হলো এটা হারাম নয় বরং মাকরূহ। আর যে সৃষ্টিবস্তুর হলফ করে তার শপথ বাস্তবায়িত হয় না, আর ঐ শপথ ভঙ্গ করলেও কাফফারা হয় না। তবে তার ছাত্ররা বলেন: যদি হলফকারী ব্যক্তি হলফকৃত বস্তুর উপর এমন তা'জীমে বিশ্বাস করে যেরূপ আল্লাহর ক্ষেত্রে করে তাহলে সেটা কুফুরী"(২)।

এখানে আমরা লক্ষ করলাম আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ভিন্ন কিছুর নামে হলফ করা বস্তুত হারাম ও মাকরূহের মাঝে নিবদ্ধ। তবে যদি

---

(১) আল-করমী, মারঈ ইবনে ইউসুফ হাম্বলী, (মৃ: ১০৩৩ হিঃ), *দলীলুত তুলেব লি নাইলিল মাতালেব* (রিয়াদ: দারু তাইবা লিন-নশরে ওয়াত তাওযীহ, ১৪২৫ হিজরী মোতাবেক ২০০৪ সাল) প্রথম সংস্করণ, তাহকীক: আবু কুতায়বা আল-ফারইয়াবী, পৃ. ৭১।

(২) নববী, আবু যাকারিয়া মহীউদ্দীন ইবনে শরফ (মৃ: ৬৭৬ হিঃ), *রওদাতুত তুলেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন,* প্রাগুক্ত খ. ১১, পৃ. ৬।

তাকফীরের কোন কারণ থাকে বা কুফুরী কোন বিষয় সংযুক্ত হয় তাহলে তা ভিন্ন কথা। যেমন, হলফ এরকম হবে যে, হলফকৃত সত্তার সাথে প্রভুসুলভ তা'জীমের সংযুক্তি বা ঐ সত্তার মধ্যে প্রভুত্বের গুণাবলি আছে বলে বিশ্বাস করা, অথবা ঐ সত্তাকে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশিদারিত্বে বিশ্বাস করা। বস্তুত এ জাতীয় কিছু একজন মুসলিমের চিন্তায় উদয়ও হতে পারে না।

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রহ. বলেন: "যার নামে হলফ করে তার তা'জীম যদি আল্লাহ তায়ালার তা'জীমের মতো মনে করে, যেমন: ঐ সত্তার ক্ষেত্রে ঐরকম তা'জীম বিশ্বাস করে যেরকম আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করে তাহলে সেটা কুফুরী। আর তার এহেন কর্মের উপর ইমাম হাকেম রহ. কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস প্রত্যাবর্তিত হবে: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন সত্তায় শপথ করলো সে কুফুরী করলো"। আর কেউ যদি মুখ ফসকিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে গাইরুল্লার নামে হলফ করে তাতে কোন মাকরূহ হবে না। বরং সেটা অনর্থক শপথের অন্তর্ভুক্ত। আর এ মর্মের উপরই প্রযোজ্য হবে বুখারী মুসলিমের এই হাদীস: যা একজন বেদুঈন সাহাবীর ﷺ ঘটনায় এসেছে যে তিনি বলেছিলেন: আমি এর উপর কিছু সংযোজনও করব না বিয়োজনও করব না। ফলশ্রুতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন: সে সফলকাম হবে- وأبيه (তার পিতার শপথ)- যদি সে সত্য কথা বলে থাকে" (১)।

ষষ্ঠ: উসিলা গ্রহণের হুকুম:

শরীয়তের দৃষ্টিতে নবী, আওলিয়া, সালেহীন বা উত্তম আমল দ্বারা উসিলা দিতে কোনো আপত্তি নেই। কেননা বিশিষ্ট বিদ্বানগণের নিকট এটা জায়েয এবং আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপকতায় সন্নিবিশিত :

---

(১) আল-আনসারী, আবু ইয়াহইয়া জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ (মৃ:৯২৬ হিঃ), *আসনাল মাতালিব ফি শরহে রওদিত তুলেব,* (দারুল কিতাবিল ইসলামী), খ. ৪, পৃ. ২৪২।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣٥﴾ [سورة المائدة:٣٥].

অর্থ: "ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় করো, আর তাঁর পথে উছিলা অন্বেষণ করো, আর তাঁর পথে জিহাদ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

উসিলার বৈধতার ক্ষেত্রে মাযহাবগুলোর নানা বর্ণনা থেকে হানাফী মাযহাবের বিশেষ কিতাব *হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন (ফতোয়ায়ে শামীতে)* এসেছে: "আর দোয়ার আদবের অন্তর্ভুক্ত হলো উসিলা গ্রহণ করা যেরূপ 'হিস্ন' কিতাবে এসেছে। আর এক বর্ণনায় এসেছে: "হে আল্লাহ! আপনার নিকট প্রার্থনাকারীদের যে প্রাপ্তি আছে তার উসিলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, এবং এই পদচারনার উসিলায় যা আমি আপনার দিকে চালিয়েছি। কেননা গৌরব, অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা প্রসিদ্ধি লাভ ইত্যাদির জন্য আমি মোটেই বের হইনি"...(১)

মালেকী বিশিষ্টবর্গ থেকে *শরহুল খারশী*তে এসেছে: "আর বিশেষ কিছু সৃষ্টসত্তার নামে উসিলা দেয়া জায়েয। অপরদিকে আল্লাহর উপর শপথ করে তার বিশেষ সৃষ্টির মাধ্যমে দোয়া করা; যেমন কোন ব্যক্তির এরূপ বলা: বিহাক্কি মুহাম্মাদিন (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকারে) আমাদের ক্ষমা করুন। তাহলে এটা শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম নিয়ে বিশেষভাবে বলা যাবে(২)।

হাম্বলী বিশিষ্টবর্গ থেকে ইমাম বুহুতীর *শরহুল মুনতাহায়* এসেছে: "দোয়া কবুলের আশায় নেককার বান্দাদের দ্বারা উসিলা গ্রহণ জায়েয আছে। হযরত ওমর ﷺ হযরত আব্বাস ﷺ এর উসিলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া ﷺ করেছিলেন ইয়াযিদ ইবনে

---

(১) ইবনে আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন (মৃ: ১২৫২ হিঃ), *রদ্দুল মুহতার আ'লা দুররিল মুখতার* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১২হি.=১৯৯২ খ্রি), তৃতীয় সংস্করণ, খ. ৬, পৃ. ৩৯৭।

(২) খরশী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মালেকী, (মৃ:১১০১ হিঃ), *শরহু মুখতাসারিল খলিল*, (বৈরুত: দারুল ফিকির লিতত্বায়াহ), খ. ৩ ,পৃ. ৫৪।

আসওয়াদ ﷺ এর দ্বারা, আবার তার দ্বারা দাহ্হাক ইবনে কায়েসও করেছিলেন, যেটা ইমাম মুয়াফিক্ব উল্লেখ করেছেন"(১)।

উল্লেখিত বর্ণনার আলোকে বলিঃ উসিলার মাসয়ালা কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হলো কি করে?! অথচ এটা যায়েয হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে। পুরো উম্মত যদি নাও বলি, অন্তত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ফকীহদের জায়েয হওয়ার ব্যাপারে প্রায় ঐকমত্য বিদ্যমান।

সপ্তমঃ বিদয়াতের অর্থ ও তার প্রকারভেদঃ

শাব্দিক অর্থে বিদয়াত হলো, নবসৃষ্ট বিষয়। যেমন বলা হয়ঃ أَبْدَعَ অর্থাৎ সে এমন জিনিস আবিষ্কার করল যার নজীর পূর্বে নাই।

আর শরয়ী পরিভাষায় বিদআত দুইভাবে বিভক্তঃ

নিকৃষ্ট বিদয়াত (বিদয়াতুস সাইয়েয়াহ)ঃ শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। রাসূল ﷺ বলেছেনঃ "যে আমাদের এই দ্বীনি বিষয়ে এমন কিছুর নবজন্ম দিল যেটা এ দ্বিনের অংশ না সেটা পরিত্যাজ্য" (সহীহ মুসলিম)। আর যেটার শরীয়তে ভিত্তি রয়েছে সেটাকে এ অর্থে বিদয়াত বলা যাবে না।

উৎকৃষ্ট বিদয়াত (বিদয়াতুল হাসানাহ)ঃ আর তা হলো মহান শরীয়তে যার ভিত্তি রয়েছে। যেরূপ ওমর ﷺ তারাবীহ সালাতে একত্রিত করে বলেছিলেনঃ "এটা কতই না উত্তম বিদয়াত"। ইমাম মালেক (রহঃ) তার *মুয়াত্তায়* এটা বর্ণনা করেছেন।

বিদয়াতের ক্ষেত্রে সারকথা হলো, বিদয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে না যতক্ষণ না এটা শরয়ী নুসুসের বৈপরিত্য প্রকাশ করে এবং ইসলামী শরীয়তের সার্বজনীনতায় যার কোন প্রমাণসরূপ উপস্থাপিত উদ্ধৃতি না থাকে। আর যদি কুরআন-সুন্নাহের ব্যাপকতায় এটা শামিল হয় তাহলে ঐ কর্মকে বিদয়াত বলা হবে না। যেমন ধরুন 'জিকির'; এটা একটা শরীয়ত সম্মত বিষয়। এখন যদি এটা কেউ দাঁড়িয়ে করে বা বসে করে, আস্তে করে বা জোরে করে, কুরআন সুন্নাহে বর্ণিত শব্দ দ্বারা করে বা

---

(১) আল-বুহুতী, মানসুর ইবনে ইউনুস আল-হানবলী (মৃঃ ১০৫১ হিঃ), *দাকায়েক্ব উলিন নুহা লি শরহিল মুনতাহা* (আলামুল কুতুব, ১৪১৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৩ সাল), প্রথম সংস্করণ, খ.১, পৃ. ৩৩৫।

জিকিরকারী নিজের গৃহীত শব্দে করে, একাকী করে বা সম্মেলিত করে তার এ কাজকে বিদয়াহ বলা যাবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপকার্থের ভিত্তিতে এটা শরীয়ত সম্মত:

﴿فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾ [سورة البقرة:١٥٢].

অর্থ: "সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না"।

আর যে ব্যক্তি বিদয়াতের নাম বলে মানুষের উপর সংকীর্ণতা আরোপ করে, কঠোরতা অবলম্বন করে তার কোন প্রমাণাদি নেই। বরং সে শরীয়তের সাইনবোর্ডে মানুষকে সমস্যায় নিপতিত করে এবং তাদেরকে দ্বীনের মাঝে বিদয়াতের প্রবর্তনকারী হিসেবে সম্বোধন করে। শুধু তাই না মানুষের জীবনধারার শরীয়তসিদ্ধ অনেক বিষয়কে তাদের জন্য সংকীর্ণ করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়াদের আ. প্রেরণ করেছেন মানুষদের থেকে সংকীর্ণতা দূর করতে; এজন্য না যে তারা তাদের উপর জটিলতা তৈরি করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة:١٨٥].

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না"।

অষ্টম: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা-মাযহাব, তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি এবং বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম:

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত হলেন তারা, যারা নবী কারীম ﷺ ও তার সাহাবীগণ ﷺ আকিদা ও আমলে যে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা আঁকড়ে ধরেন। আর ঐ সকল মূলনীতি গ্রহণযোগ্য মাযহাবের উলামায়ে কেরামের আকিদা ও ফিকহী আলোচনায় পরিগ্রহীত হয়। আর তাদের ব্যাপারেই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' উপাধি প্রয়োগ করা হয়। তারা একক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অনুসারী সংখ্যা অন্যান্য সমস্ত দলের সব মিলিয়ে যত সংখ্যা হয় তার থেকেও বহুগুণে বেশি। এজন্যই হাদীসে

বর্ণিত ইসলামী উম্মাহের "আস-সাওয়াদুল আ'যম বা বৃহত্তম জনগোষ্ঠী" তারাই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দৃষ্টিতে ইসলামী আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য দু'টি প্রসিদ্ধ মতবাদ হলো- মাযহাবুল আশাঈরাহ ও মাযহাবুল মাতুরিদিয়্যাহ। এ দুই মতবাদের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী রহ. ও ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদী রহ.-এই দুইজন শ্রেষ্ঠ ইমাম ও হক্বপন্থী মনীষীর নামে। উভয়েই ছিলেন হেদায়তের দীপ্তময় প্রদীপ, যাদের চিন্তা ও কর্মধারা উম্মাহর মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও গৃহীত।

আকীদার ময়দানে এই দুই মাযহাবই সুস্পষ্ট রূপরেখা ও নির্ভরযোগ্য গবেষণাপদ্ধতির মাধ্যমে এমন সব মূল্যবান কিতাবাদি উপহার দিয়েছে, যেগুলো প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত, দলীলভিত্তিক ও যুক্তির কাঠামোতে সুসংঘটিত। এসব কিতাবেই বিদ্যমান রয়েছে এমন সব অকাট্য প্রমাণ, যা বিভিন্ন যুগে উদ্ভূত সংশয়, বিভ্রান্তি ও মতানৈক্যের মুকাবেলায় ঢালস্বরূপ কাজ করে আসছে। এসব কিতাবের উপর ভিত্তি করেই নবসৃষ্ট সংশয়ের মোকাবেলা ও ইসলামী আকিদার প্রমাণাদি যুগের মলাটে ব্যক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

নবম: আশয়ারী-মাতুরিদীদের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম

আশয়ারী (ও মাতুরিদী) হযরতগণ নানা যুগের ধারায় এবং সময়ের পরিক্রমায় উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ছিলেন। তাদের জ্ঞানী-গুণী ও ফকীহগণ ইসলামী খিলাফার কর্ণধার এবং ইলমী গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর তারাই বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নানা শাস্ত্রের কিতাবাদি প্রণয়ন এবং শিক্ষার্থীদের তা শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকতেন। আবার তারাই ইসলামী শরীয়তের আহকাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্বশীল হতেন এবং দ্বীনে হানিফ তথা ইসলামের প্রতিরক্ষায় থাকতেন। শুধু তাই না তারা ছিলেন ন্যায়পরায়ণতা এবং ইনসাফে প্রবাদতুল্য।

এদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ হলেন ইমাম সুলতান আল-ফাতিহ সালাহ উদ্দিন আল-আইয়ূবী রহ.; যিনি কুদসের বিজেতা এবং ক্রুসেডারদের কালো হাত থেকে তা মুক্তকারী। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ. তার

ব্যাপারে বলেন: "সুলতান সালাহ উদ্দিন আল-আইয়ূবী; মাযহাবে শাফেয়ী এবং আকিদায় আশয়ারী ছিলেন। সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ূবী রহ. মুয়াজ্জিনদের আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তারা তাসবীহ পড়ার সময় আশয়ারী আকিদার ইলান করে। এমনকি তিনি মুয়াজ্জিনদের বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছিলেন যাতে তারা প্রতি রাতে তা বর্ণনা করেন। সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ূবী রহ. কুরআনে হাফেজ ছিলেন এবং ফিকহে শাফেয়ীর *"আত-তাম্বীহ"* কিতাবেরও হাফেজ ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক বেশি দ্বীনদার, পরহেযগার, মহান গাযী, মুজাহিদ এবং আল্লাহভীরু। আর যখন এই সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ূবী রহ. ইমাম আশয়ারীর রহ. আকিদার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিলো; সে সূত্রে বিশিষ্ট নাহুবিদ শায়েখ মুহাম্মদ বিন হিবাহ আকিদায় একটি কিতাব সংকলন করেন এবং তা সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ূবী রহ. সমীপে হাদিয়া পেশ করেন। ফলে তিনি এতে আরো বেশি মনোযোগী হন এবং তা শিক্ষাদানের নির্দেশ দেন; এমনকি মক্তবের ছোট বাচ্চাদেরকেও। পরবর্তীতে কিতাবটি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ূবী রহ. দিকে নিসবত রেখে *"আকিদাতুস স্বলাহিয়্যাহ"* নামে পরিচিতি পায়।

উল্লেখিত বিশিষ্ট উলামা ও সুলতানদের পাশাপাশি এখানে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উলামায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করবো:

১. আকিদা ও উসূলে ফিকহে প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম:

- ইমাম আল-বাকিল্লানি (মৃত্যু: ৪০৩ হি:) : সম্পূর্ণ নাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে তৈয়ব। তিনি ছিলেন মালিকি মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ইমাম এবং "শায়খুস সুন্নাহ" ও "লিসানুল উম্মাহ" উপাধিতে ভূষিত। আশ'আরী আকীদা ধারার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী রহ.-এর পর তাঁর পথের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র ও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে ইমাম বাকিল্লানীর নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞায় তিনি এতটাই সমুজ্জ্বল ছিলেন যে, তাঁকে চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারক হিসেবে গণ্য করা হয়।

- ইমাম ইবনু ফুরাক (মৃত্যুঃ ৪০৬ হিঃ)- তাঁর পূর্ণ নাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনু ফুরাক আল-আনসারী ইস্পাহানী। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, উসূলবিদ এবং মুতাকাল্লিম। একইসাথে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহদের একজন। তিনি বসরা ও বাগদাদ থেকে হাদীস অন্বেষণ করেন এবং পরে নিশাপুরে তা বিস্তার করেন। সেখানে তিনি একটি জ্ঞানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা আকীদা ও হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- ইমাম জুয়াইনি (মৃত্যুঃ ৪৭৮ হিঃ) - তাঁর পূর্ণ নাম আবুল মায়ালী আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একজন মহান ইমাম, যিনি এক ইলমী ও ধর্মপরায়ণ পরিবারে বেড়ে উঠেন। তাঁর পিতা ছিলেন নিশাপুরের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও ফকীহ। ইমাম জুয়াইনি রহ.-এর রচনাসমূহ তাফসীর, ফিকহ, উসূল, আকীদা ও ইবাদতের নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও অবদানের কারণে তাঁকে ইমামুল হারামাইন উপাধিতে ভূষিত করা হয়, কারণ তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনায় ইমামতি ও শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন।

- ইমাম গাযালী (মৃত্যুঃ ৫০৫ হিঃ) : হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ আশ-শাফেয়ী আল-আশয়ারী। তিনি ছিলেন একাধারে একজন ফকীহ, উসূলবিদ এবং ক্ষুরধার মুতাকাল্লিম। ত্বরীকার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন সুফী। ইলমুল কালামের জগতে আশ'আরী ধারার একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। তাঁর জ্ঞান, সাধনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের জন্য তিনি জীবদ্দশায় বহু উপাধিতে ভূষিত হন। এর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত উপাধি হলো হুজ্জাতুল ইসলাম। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য উপাধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ যাইনুদ্দিন, মিহিজ্জাতুদ্দীন, আল-আলিমুল আওহাদ, মুফতীল উম্মাহ, বারাকাতুল আনাম, ইমামু আয়িম্মাতিদ্দীন এবং শরফুল আয়িম্মাহ।

- **ইমাম রাযী (মৃত্যুঃ ৬০৬ হিঃ):** আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর আল-কুরাশী, আশ-শাফেয়ী, আল-আশয়ারী। তিনি ফখরুদ্দীন রাযী, মুতাকাল্লিমিনদের শিরোমণি ও শায়খুল মা'কুল ওয়া মানকুল উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ছিলেন মহান মুফাসসির, ফকীহ এবং উসূলী। তিনি ছিলেন বহু শাস্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞ। যার আলোচনা, গবেষণা, লিখন ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র থেকে শুরু করে সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান যেমনঃ পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং জ্যোতি শাস্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তিনি আশয়ারী ধারার প্রধান এবং উক্ত মানহাযের সংস্কারক ছিলেন। তিনি এমন ছিলেন, যখন তিনি বাহনে আরোহণ করতেন তখন বহু ছাত্র তাকে ঘিরে নানা শাস্ত্রে জিজ্ঞাসা করতে থাকতেন।

২. কুরআনুল কারীমের তাফসীর ও হাদীস শরীফে প্রাজ্ঞ প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামঃ

- **ইমাম বায়হাকী (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হিঃ):** আহমদ ইবনুল হুসাইন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুতকীন মুহাদ্দীস। বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা এবং আলোকপ্রদ অবদানের সাক্ষী। তার ব্যাপারে বলা হয়ঃ "প্রত্যেক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীই ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অনুগ্রহপ্রাপ্ত; তবে ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকী (রহ.) ব্যতিক্রম। কারণ, শাফেয়ী মাযহাবের প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান এতই বিশাল যে বলা চলে, বরং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-ই তাঁর নিকট ঋণী।" তার ব্যাপারে ইমাম সাফাদী রহ. বলেনঃ "তিনি ফিকহ, হাদীস, ওয়াজ-নসীহা এবং সুলতানদের নিকট উঁচু মর্যাদায় অনেক মহান ইমামদের একজন ছিলেন। পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সততা, বিশ্বস্ততা এবং চমৎকার ভূষণ অবলম্বনের সাথে সাথে ছিলেন উত্তম আখলাকের অধিকারী।"

- **ইমাম কুশাইরী (মৃত্যুঃ ৪৬৫ হিঃ):** আবুল কাসেম আব্দুল কারীম ইবনু হাওয়াযান। যুহুদে ও দ্বীনি ইলমী পারঙ্গমতায় তিনি ছিলেন তার যামানার শায়েখ। তার অবস্থান স্থল ছিলো নিশাপুরে এবং সেখানেই তিনি

ইনতিকাল করেন। সুলতান আলব্ আরসালান তাকে অত্যন্ত মূল্যায়ন ও সম্মান করতেন। তিনি আশয়ারী ধারার একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। তার অন্যতম কিতাব হলো:

ক. التيسير في التفسير

খ. لطائف الإشارات في التفسير

গ. الرسالة القشيرية في التصوف

- ইমাম বাগাভী (মৃত্যু: ৫১০ হি:): আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ আল-বাগাভী। তিনি রুকনুদ্দিন, শায়খুস সুন্নাহ, মহীউস সুন্নাহ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ছিলেন একাধারে শাফেয়ী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির এবং জ্ঞানের মহাসমুদ্র। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কালামের তাফসীর লিখেছিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর জটিল বিষয়গুলোর চমৎকার বিশ্লেষণ করেছিলেন। হাদীস বর্ণনা করেছেন; দিয়েছেন তার দার্‌স। আর তিনি কখনো অযু ব্যতীত দরস দিতেন না। তার কিছু গ্রন্থাবলি যেমন: *"আত-তাহযীব ফিল ফিক্‌হ"*, *"শরহুস সুন্নাহ ফিল হাদীস"*, *"মায়ালিমুত তানযীল ফি তাফসীরিল কুরআনিল কারীম"*, *"আল-মাসাবীহ"*, *"আল-জাময়ু বাইনাস সহীহাইন"*।

- ইমাম ইবনু আসাকির আদদিমাশকি (মৃত্যু: ৫৭১ হি:): আল-ইমাম, আল্লামা, হাফিযুল কাবীর, মুহাদ্দিসুস শাম। তিনি ষষ্ঠ বছরেই তার পিতা এবং ভাই থেকে হাদীস শ্রবণ শুরু করেছিলেন। এরপর দিমাস্কের বহুসংখ্যক শায়েখ এবং উলামাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার অন্যতম একটি কিতাব হলো: " تَبْيِينُ كَذِبِ الْمُفْتَرِي فيمَا نُسِبَ إلى الإمام أبي الحَسَن الأَشْعَرِي" এই কিতাবে তিনি ইমাম আশয়ারী ও আশয়ারী ধারার পক্ষে লড়েছেন।

- ইমাম নববী (মৃত্যু: ৬৭৬ হি:) : ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আল-হুজামী আন-নববী আশ-শাফেয়ী। তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, ফকীহ,

ভাষাবিদ এবং প্রকৃত মুসলিম ছিলেন। তিনি ফিকহ, হাদীস, আরবী ভাষা, রিযাল শাস্ত্রে বহু লিখনি এবং কিতাব রচনার মাধ্যমে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। যেমন: *"রিয়াদুস সালেহীন"*, *"আরবাঈন আন-নববীয়্যাহ"*, *"মিনহাযুত ত্বালেবীন"*, *"আর-রওজা"* ইত্যাদি। তার ক্ষেত্রে সম্বোধন করা হয় যে, তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একাধারে সম্পাদক, সংস্কারক, সূক্ষ্মবিশ্লেষণবেত্তা এবং সুবিন্যস্তকারী। ইমাম নববী রহ. কে "শায়খুস শাফেয়িয়্যাহ" বা শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম প্রধান মুরব্বী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

- ইমাম বাইযাবী (মৃত্যু: ৬৮৫ হি:): নাসিরুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আশ-শিরাজী আল-বায়যাবী। ইসলামী জ্ঞানের সমস্ত শাস্ত্রে তিনি কিতাব রচনা করেছেন। সমগ্র দুনিয়া তাকে তাহকীক এবং ইলমী সুদৃঢ়তায় অনন্যভাবে চিনে। তার কিতাবাদি যেমন: *"তাফসীরু আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাওয়ীল"*, *"আল-গয়াতুল কুসওয়া ফি দিরায়াতিল ফাতওয়া"*, *"শরহু মুখতাসারি ইবনে হাযেব ফিল উসুল"*, *"আল-মিনহায ফি উসুলিল ফিকহ"* ইত্যাদি।

- ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (মৃত্যু: ৮৫২ হি:): আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে আলি। তিনি আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ভূষিত। তিনি ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বে ছিলেন। আবার তিনি দারুল আদলে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি। তিনি অধ্যাপনায় খুব বেশি যত্নশীল ছিলেন এবং এতেই বেশি নিয়োজিত ছিলেন। এমনকি বিচার ফয়সালা এবং ইফতার দায়িত্বের প্রাক্কালেও কোন কিছু তাকে তার অধ্যাপনার কাজ থেকে বিমুখ করতে পারেনি। তিনি তার যুগে ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যাপনা করেছেন। যেমন: আল-মাদরাসাতুস শাইখুনিয়্যাহ, আল-মাহমুদিয়্যাহ, হাসানিয়্যাহ, বাইবারসিয়্যাহ, ফখরিয়্যাহ, সলাহিয়্যাহ, মুয়াইয়িদিয়্যাহ।

- ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (মৃত্যু: ৮৫৫ হি:): মাহমুদ ইবনে আহমদ। তিনি একাধারে ছিলেন হাফিয, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবেত্তা। ছিলেন

হিজরী নবম শতাব্দীর একজন মহান মনীষী। তিনি ছিলেন হানাফী পণ্ডিতদের একজন। তার গ্রন্থাবলি, যেমন: *"উমদাতুল ক্বারী ফি শরহে সহীহিল বুখারী"* আর এটা বুখারী শরীফের অন্যতম একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ, এ কিতাব সংকলনে তিনি বিশ বছর ব্যয় করেছিলেন। আবার তিনি ফিকহে হানাফীতে লিখেন *"আল-বিনায়া ফি শরহিল হিদায়া"* এছাড়াও আরও অন্যান্য গ্রন্থ।

- ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হি:): মূল নাম আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর। তার প্রায় ৬০০ এর মতো গ্রন্থাবলি রয়েছে। কায়রোতে ইয়াতীম অবস্থায় বড়ো হন। যখন তিনি ৪০ বছরে উপনীত হন তখন সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করে তার অধিকাংশ কিতাব লিখেন। বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ এবং আমির ওমারাগণ তার কাছে সাক্ষাতে আসতো এবং নানা অর্থকড়ি ও উপঢৌকন পেশ করতো কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিতেন। তার গ্রন্থাবলি যেমন: *"আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন"*, *"ইতমামিদ দ্বিরায়া লিকুররা ইন নুকায়া"*, *"আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের ফিল আরাবিয়্যাহ"*, *"ফুরুউস শাফেয়ীয়্যাহ"*, *"আল-ইকতিরাহ ফি উসুলিন নাহু"*, *"আল-ইকলিল ফি ইসতিনবাতিত তানযীল"*।

৩. ইলমুল ফিকহিল ইসলামী:

- ইমাম ইয ইবনু আব্দিস সালাম (মৃত্যু: ৬৬০ হি:): মূল নাম আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুস সালাম। তিনি ইযউদ্দিন, সুলতানুল উলামা ও বায়িউল মুলুক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। পরহেযগারী এবং তাকওয়ায় ছিলেন অত্যন্ত মহান একজন আলেম। আবার প্রভাব এবং মর্যাদায় ছিলেন সুদৃঢ়। মাযহাবে ছিলেন শাফেয়ী আর আকিদায় ছিলেন আশয়ারী। তার লেখা কিতাবসমূহ থেকে যেমন: *"ইখতিসারু নিহায়াতিল মাতলাব"*, *"আল-কাওয়ায়েদুল কুবরা"*, *"আল-কাওয়ায়েদুস সুগরা"*।

- ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী (মৃত্যু: ৭২৭ হি:): মূল নাম আব্দুল ওহহাব ইবনে আলী। তিনি ছিলেন একাধারে শাফেয়ী ফকীহ, আশয়ারী

পণ্ডিত, আরবী ইতিহাসবেত্তা এবং দিমাস্কের প্রধান কাযী। তার গ্রন্থাবলি যেমন: *"আস-সাইফুল মাশহুর ফী শরহে আকিদাতি আবি মানসুর"*, *"শরহু মুখতাসারি ইবনু হাযিব"*, *"আল-ইবহায ফি শরহিল মিনহায"*, উসুলে ফিকহে *"শরহু মিনহাযিল বাইযাবী"*, *"ত্বকাতুস শাফেয়িয়্যাহ কুবরা, উসতা ও সুগরা"*, উসূলে ফিকহে *"জময়ুল জাওয়ামে"*।

- ইমাম কামাল ইবনুল হুমাম (মৃত্যুঃ ৮৬১ হিঃ): মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ। তিনি হানাফী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি একাধারে উসূল, তাফসীর, ফিকহ, ফারায়েয, গণিত, তাসাউফ, নাহু, সরফ, মায়ানী, বায়ান, বদীই, মানতেক, জাদাল ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তার প্রসিদ্ধ কিতাব যেমন: ফিকহে হানাফীর হিদায়া কিতাবের শরাহ *"ফতহুল ক্বাদীর"*, *"আত-তাহরীর ফি উসুলিল ফিকহ"*, *"আল-মুসা'ইয়ারা ফি আকায়িদিল মুনজিয়াহ ফিল আখিরাহ"*, আবার তার হানাফী শাখাগত মাসয়ালা নিয়ে লিখিত *"যাদুল ফকীর"*।

- শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (মৃত্যুঃ ৯২৬ হিঃ): তিনি ছিলেন শাফেয়ী ও আশয়ারী ধারার অন্যতম একজন মহান পণ্ডিত। তিনি তার যামানায় উত্তম আচার, উৎকৃষ্ট আখলাক ও গুণাবলিতে সজ্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবাদ পুরুষ ছিলেন। উত্তম আচরণের এমন কোন তরীকা ছিলো না যা তিনি পরিগ্রহণ করেননি। তিনি অধ্যাপনা, বিচার-ফয়সালা এবং শিক্ষা সচিবালয়ের বহু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহু শাস্ত্রীয় জ্ঞান, মাকবুল গ্রন্থ রচনা, সর্বোৎকৃষ্ট আখলাক, উত্তম পন্থা অবলম্বন, ধীরস্থিরতা, আকাবিরদের আঁকড়ে ধরার মতো বহুমাত্রিক গুণ তার মধ্যে একত্রিত হয়েছিল যা অন্য কারো মাঝে হয়নি। নানা শাস্ত্রে, ইসলামী নানা জ্ঞানে তার অনেক রচনা রয়েছে; যেমন, আকিদা, ফিকহ, উসূল, তাসাউফ, সুলুক, নাহু, তাজভীদ, দোয়া-দরুদ, হাদীস সহ আরো অন্যান্য।

- ইমাম ইবনে হাজর হাইতামী (মৃত্যুঃ ৯৭৩হিঃ): মূল নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলহাইতামী আল-মক্কী। শাফেয়ী ফকীহ এবং আশয়ারী মুতাকাল্লিম। বাল্যকালেই তিনি কোরআনুল কারীম হিফয করেন। সাইয়্যেদ

আহমদ বাদাওয়ী এর পাঠশালায় তিনি প্রাথমিক পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি আযহার গমন করেন। তার শায়েখগণ তাকে ফতোয়াপ্রদান এবং দরসদানের অনুমতি দেন অথচ তখন তার বয়স ২০ এরও কম। তিনি অনেক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, যেমনঃ তাফসীর, হাদীস, কালাম, উসূলে ফিকহ, ফিকহ, ফারায়েয, গণিত, নাহু, সরফ, মায়ানী, বায়ান, মানতেক, তাসাউফ ইত্যাদি। তিনি মক্কাতুল মুকাররমার প্রতিবেশিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শাফেয়ী ফিকহের অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিত্ব। (১)

---

(১) এভাবে মাতুরিদী ইমামগণও সকল যুগে সকল বিভাগে পুরো উম্মতের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। আমরা নিচে উদাহরণসরূপ কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করছি।

- ইমাম হাকিম আস-সমরকান্দি রহ. (মৃ. ৩৪২ হি.): আবুল কাসেম ইসহাক বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম আল হাকিম আস সমরকান্দি ছিলেন একজন বিশিষ্ট হানাফি ফকিহ ও আলেম এবং মাতুরিদী আকিদার প্রতিষ্ঠাতা আবু মনসুর আল মাতুরিদির অন্যতম শিষ্য। গভীর প্রজ্ঞা ও নৈতিক শিক্ষাদানের কারণে তিনি "আল হাকিম" (জ্ঞানী) উপাধি লাভ করেন। আকিদা শাস্ত্রে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা *"আস-সাওয়াদ আল আ'যম (السواد الأعظم)"*। কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হলেও মাতুরিদি আকিদার প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থগুলোর একটি।

- ইমাম আবুল ইউসর মুহাম্মাদ বাযদাভী রহ. (মৃ. ৪৯৩ হি.) ছিলেন একজন মহান ইসলামী ফকিহ, হাদিস বিশারদ ও বিজ্ঞ আলেম। একজন প্রখ্যাত হানাফি ফকীহ, উসূলবিদ, এবং আকিদা শাস্ত্রের মহান ইমাম ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (রহ.) এবং আবুল উসর (أبو العسر) আল-বাযদবী, যিনি তার আপন ভাই ছিলেন এবং যিনি হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। ইমাম আবুল ইউসর বাযদবী (রহ.) আকিদা বা ইলমুল কালাম শাস্ত্রে তাঁর মূল্যবান অবদান রেখেছেন। এ শাস্ত্রে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কিতাব হলঃ *"উসূলুদ-দীন" (اصول الدين)*।

- **ইমাম আবুল মুঈন আন-নাসাফী রহ. (মৃ. ৫০৮ হি.)** ছিলেন একজন প্রখ্যাত হানাফি ফকীহ, আকীদা শাস্ত্রবিদ ও মাতুরিদি ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম। ইমাম মাতুরিদী রহ. এর পরে মাতুরিদী ধারায় যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন তিনি হলেন এই আবুল মুঈন নাসাফী রহ.। আকিদা শাস্ত্রে তিনি একাধিক কিতাব রচনা করেন। যেমনঃ ক. تَبْصِرَةُ الْأَدِلَّة মাতুরিদী আকীদার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দলিলভিত্তিক কিতাব। খ. التمهيد لقواعد التوحيد - তাওহীদের মৌলিক ভিত্তি নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল রচনা। গ. بَحْرُ الْكَلَام فِي عِلْمِ التَّوْحِيد - (বাহরুল কালাম ফি ইলমিত তাওহীদ)।

- **ইমাম আবু ইসহাক ওয়ায়েলী আল-সাফফার রহ.** (মৃ. ৫৩৪ হি.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত হানাফি ফকীহ, মাতুরিদী আকিদার বিশিষ্ট আলেম এবং কালাম শাস্ত্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ। তিনি মাতুরিদী ধারার অন্যতম একজন ইমাম ছিলেন। আকিদা শাস্ত্রে তার অন্যতম কিতাব হলোঃ تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد (তালখীস আল-আদিল্লা লিকাওয়ায়িদ আত-তাওহীদ): এই গ্রন্থটি মাতুরিদী আকিদার একটি মৌলিক রচনা, যেখানে তিনি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, একত্ব ও গুণাবলির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

- **ইমাম আবু হাফস উমর নাসাফী রহ. (মৃ. ৫৩৭ হি.)** ছিলেন এক মহিমান্বিত ইসলামী পণ্ডিত, ফকিহ ও মুতাকাল্লিম, তার লকব ছিলো মুফতিয়ে সাকালাইন। তিনি হানাফি মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন এবং কালামশাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা العقائد النسفية আকায়িদুন নাসাফিয়া, যা ইসলামী বিশ্বাসগত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করে। শুধুতাইনা শতাব্দীর পর শতাব্দী শিক্ষার্থীদের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

- **ইমাম নুর উদ্দিন আহমদ আস-সাবুনী রহ. (মৃ. ৫৮০ হি.)** ছিলেন জ্ঞানের মশালবাহী এক মহান আলেম, যিনি ফিকহ, আকাইদ ও হাদিসশাস্ত্রে গভীর প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ছিলেন হানাফি মাজহাবের অন্যতম বিশিষ্ট

ব্যাখ্যাকার এবং কালামশাস্ত্রে পারদর্শী এক মনীষী। আকিদা শাস্ত্রে তিনি বহু কিতাব রচনা করেন। তাঁর কিছু প্রসিদ্ধ রচনাসমূহ হলো: ক. البداية في أصول الدين (আল-বিদায়া ফি উসূলিদ্দীন), খ. المغني في أصول الدين (আল-মুগনি ফি উসূলিদ্দীন), গ. الهداية في علم الكلام (আল-হিদায়া ফি ইলমিল কালাম), ঘ. الكفاية في الهداية (আল-কিফায়া ফিল হিদায়া), ঙ. البداية من الكفاية ।

- **ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রহ. (মৃ. ৫৮৭ হি.)** ছিলেন হানাফি মাজহাবের এক উচ্চ তবকার ফকীহ ও اصول শাস্ত্রবিদ। ফিকহ, উসূল, এবং আকীদা- এই তিন শাস্ত্রেই তাঁর অনন্য দখল ছিল। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব হলো "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" - এটি হানাফি ফিকহে একটি অমূল্য বিশ্বকোষ। আকীদা শাস্ত্রে তার অন্যতম একটি কিতাব হলো: المعتمد من المعتقد ।

- **ইমাম বুরহানুদ্দীন আন-নাসাফী রহ. (মৃ. ৬৮৭ হি.)** ছিলেন ৭ম হিজরি শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত হানাফি ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, উসূলবিদ ও কালাম শাস্ত্রের বিশিষ্ট আলেম। আকিদা, মানতেক ও ফালসাফাতে তিনি একাধিক কিতাব রচনা করেন। যেমন:

جامِعُ النَّظَرِ، والنُّكَتُ المشهورةُ وشرحُها، وأساسُ الكتابةِ في الحِكمةِ، ورسالةٌ في مباحِثِ أقليدِس، والمنتَخَبُ عن نهايةِ العقولِ، ورسالةٌ في تناهي الأفعالِ، ومباحِث الفُحولِ

- **ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী রহ. (মৃ. ৭১০ হি.)** ছিলেন একজন প্রখ্যাত হানাফি আলেম ও মাতুরিদী আকিদার অনুসারী। তাফসির, ফিকহ, আকিদা ও কালামশাস্ত্রে তার ছিলো অগাধ পাণ্ডিত্য। তার রচনাসমূহে গভীর যুক্তিবাদ, সুসংগঠিত চিন্তাধারা ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর আকিদা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আকিদাশাস্ত্রে তিনি একাধিক গ্রহণযোগ্য গ্রন্থের আঞ্জাম দেন। আকিদা শাস্ত্রে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: عمدة العقائد (উমদাতুল আকাইদ): একটি সংক্ষিপ্ত আকিদার গ্রন্থ, যা সহজভাষায় লিখিত ও মাতুরিদী আকিদার মূল বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ। الوصية (আল-ওসিয়্যাহ): আকিদা ও নীতিশিক্ষামূলক একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরতাসম্পন্ন কিতাব। এই

কিতাব দুটি পরবর্তী শতাব্দীগুলোর বড় বড় হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

- ইমাম আকমাল উদ্দিন আল-বাবারতী রহ. (মৃ. ৭৮৬ হি.) আকমাল উদ্দিন আল-বাবারতী রহ. ৭১৪ হিজরী (১৩১৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে জন্মগ্রহণ করেন। আকিদা শাস্ত্রে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। এ শাস্ত্রে তার অন্যতম কিছু কিতাব হলো:

شرح وصية الإمام أبي حنيفة، الإرشاد في شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة، شرح العقيدة الطحاوية، شرح عمدة العقائد، شرح تجريد الكلام للنصير الطوسي، المقصد في الكلام، الكواشف البرهانية شرح المواقف للإيجي.

- ইমাম সাইয়িদ শরীফ যুরযানী রহ. (মৃ. ৮১৬ হি.) ছিলেন ১৪শ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত যিনি আকিদা, কালাম, ফিকহ, নাহু, বালাগাত, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও তাফসিরসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। আল্লামা যুরযানী রহ. আকিদা ও কালামশাস্ত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলো পরবর্তী যুগের আলেমদের জন্য মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিতাবসমূহ: ক. شرح المواقف (শরহ আল-মাওয়াকিফ): ইমাম আদুদুদ্দীন আল-ইজীর 'আল-মাওয়াকিফ' গ্রন্থের উপর একটি বিশদ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। খ. كتاب التعريفات (কিতাব আত-তাআরিফাত): বিভিন্ন ইসলামি শাস্ত্রের পরিভাষা ও সংজ্ঞাসমূহের একটি সংকলন, যা পরবর্তীতে পরিভাষাগত অভিধান হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষভাবে আকিদা ও ইলমুল কালামের পরিভাষা এখানে ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে। গ. رسالة في تقسيم العلوم ঘ. الكبرى والصغرى في المنطق যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে দুটি গ্রন্থ, যা পরবর্তীতে 'الغرة والدرة' নামে পরিচিত হয়। ঙ. حاشية على شرح الرسالة الشمسية (হাশিয়া আলা শরহ আর-রিসালাহ আশ-শামসিয়্যাহ): যুক্তিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

- ইমাম কাসেম ইবন কুতলুবুগা রহ. (মৃ. ৮৮৯ হি.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত হানাফি আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইতিহাসবিদ ও গবেষক। তিনি ইমাম

ইবনুল হুমাম রহ. এর শিষ্য ছিলেন এবং পরবর্তীতে তার উত্তরসূরি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ফিকহ, হাদীস, উসূল, আকিদা ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে একশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। আকিদা ও ইলমুল কালাম শাস্ত্রে তাঁর অন্যতম একটি রচনা হলো: حاشية على المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (আল-মুসামারা ফি শারহিল মুসায়ারা ফিল আকায়িদিল মুনজিয়া ফিল আখিরাহ): এটি 'আল-মুসায়ারা' গ্রন্থের উপর একটি বিশদ ব্যাখ্যা, যা আকিদা ও কালামশাস্ত্রের গভীর আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে।

- **আল্লামা ইবনু কামাল পাশা রহ. (মৃ. ৯৪০ হি.)** ওসমানী সাম্রাজ্যের একজন প্রখ্যাত হানাফি আলেম, ইতিহাসবিদ, ফকীহ, কবি ও দার্শনিক ছিলেন। সুলতান সুলায়মান আল-কানুনির শাসনামলে তিনি **শায়খুল ইসলাম** নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আকিদা ও ইলমুল কালাম শাস্ত্রে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية এই গ্রন্থে তিনি আশআরী ও মাতুরিদী আকিদার মধ্যে বারটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আলোচনা করেছেন। الإشارات في علم الكلام এটি একটি সংক্ষিপ্ত আকিদা গ্রন্থ, যেখানে কালাম শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। المنيرة في المواعظ والعقائد এই রচনায় তিনি উপদেশমূলক বক্তব্য ও আকিদার মৌলিক বিষয়সমূহ আলোচনা করেছেন। دقائق الحقائق এটি একটি দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রভিত্তিক গ্রন্থ, যেখানে তিনি বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا এটি তাঁর ১১৪টি রচনার একটি সংকলন, যার মধ্যে আকিদা ও কালামশাস্ত্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, উপরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিগুলো বান্দার সংকলিত "মাতুরিদী ইমামগণের জীবনধারা" প্রবন্ধ থেকে গৃহীত [অনুবাদক]।

উপরোক্ত উল্লেখনে সুস্পষ্ট; আশয়ারী ও মাতুরিদী ধারাই যুগের পরম্পরায় ইসলামী উম্মাহের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। তাদের আকিদা মূলত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই গৃহীত, যা সাহাবী অতপর তাবেয়ী তারপর তাদের পরবর্তীদের মাধ্যম হয়ে; কুরআন-সুন্নাহ, আকলী ও নকলী দলীল কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে; খাঁটি, নির্মল এবং স্বচ্ছভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আর যে আশয়ারী মানহায যুগের পালাবদলে ইসলামী সভ্যতাকে বিনির্মাণ ও সুমহান করেছে তা কোন বিদয়াতী গোষ্ঠী হবে তা অসম্ভব, যদিও কিছু বিশৃঙ্খল ও বিছিন্নবাদীরা দাবী করে থাকে।

দশম: আকিদা পাঠদানের মানহায এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আশায়েরাদের নিকট গ্রহণযোগ্য আকিদার কিতাব।

এখানে আমরা ইসলামী আকিদার গ্রন্থাবলির মধ্যে আশয়ারী ধারার পাঠদান পদ্ধতি উল্লেখ করবো। তালিবে ইলমদের মান অনুযায়ী আশয়ারীদের ধারা মোটামোটি তিন স্তরে বিন্যস্ত। তো সেখানে একটি যেমন: প্রাথমিক স্তর, আবার মাধ্যমিক স্তর, অন্যটি উচ্চস্তর।

প্রাথমিক স্তরে ইলমুল আকিদায় প্রসিদ্ধ কিতাব:

ক. জাওহারাতুত তাওহীদ (جوهرة التوحيد): যা ইমাম ইবরাহীম লাক্কানী মালেকী রহ. (মৃত্যু: ১০৪১ হি.) কতৃক লিখিত। তার উপাধি ছিলো আবুল ইমদাদ। উপরোক্ত কিতাবটি আকিদার কবিতামূলক রচনা। এ পদ্যের লেখক নিজেই এর একাধিক ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য অনেক উলামায়ে কেরামও। তারা এটার উপর নানা টিকা সংযোজন এবং হাশিয়া নিরূপণ করেছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এমনকি বর্তমান পর্যন্ত ছাত্ররা এটা মুখস্থ করে আসছে। তাছাড়া জর্দানের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী সামাহাতুস শায়েখ নুহ আল-কুদাত রহ.ও এটার একটি শরাহের আঞ্জাম দিয়েছেন।

খ. উম্মুল বারাহীন (أم البراهين): আকিদায় ইমাম সানুসীর রহ. (মৃ: ৮৯৫ হি.) এর অতিসংক্ষিপ্ত এক চমকপ্রদ কিতাব এটি। তিনি ঐ সকল মহান আলেমদের অন্তর্ভুক্ত যারা ইসলামী আকিদার গ্রন্থসমূহকে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ শাস্ত্রে তার অনেক কিতাব বিদ্যমান। তন্মধ্যে অন্যতম হলো এমন পাঠ্যক্রম যা অনুযায়ী তালিবুল ইলম প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে। সেসকল কিতাব যেমন: কিতাবুল মুকাদ্দিমাত (كتاب المقدمات), এরপর সুগরাস সুগরা (صغرى الصغرى), এরপর উম্মুল বারাহীন (أم البراهين), এরপর উস্‌তা (عقيدة الوسطى), এরপর হলো: কুবরা (عقيدة الكبرى)। ইমাম সানুসী রহ. এর প্রত্যেকটি কিতাবের উপর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। উলামাগণ তার এসকল কিতাবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তারা এগুলোর উপরে প্রচুর শরাহ ও হাশিয়া প্রণয়ন করেছেন।

গ. আল-খরিদাতুল বাহিয়্যাহ (الخريدة البهية): লিখেছেন ইমাম দারদীর আল-আদাওয়ায়ী আল-মালেকী আল-খালওয়াতী রহ. (মৃ: ১২০১ হি:)। যিনি মূলত ইমাম আহমদ আদদারদীর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি নিজেই এই কিতাবের শরাহ করেন। তিনি ছাড়াও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এটার শরাহ লিখেন।

ঘ. কাওয়ায়েদুল আকায়েদ (قواعد العقائد): লিখেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ আল-গাযালী রহ. (মৃ: ৫০৫ হি:)। এ কিতাবে লেখক রহ. এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শামিল করেছেন যেগুলো দ্বীন পালনে একজন মুসলমানের জন্য জানা আবশ্যক। এ কিতাবের জ্ঞানগত গভীরতার মাহাত্ম্যের কারণে তিনি তার মহাবিস্ময়ের কিতাব *"ইহইয়ায়ু উলুমুদ্দিনের"* প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্তি করেছেন। আর আমাদের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা নিরূপণে হাত দিয়েছেন, ফলে বহু উলামায়ে কেরাম এর শরাহ করেছেন। সে সকল উলামাদের মধ্য অন্যতম: আল্লামা

মুহাদ্দিস ইমাম মুরতাযা যাবিদী ও শায়েখ আল-ফকীহ যাররূক আল-পাসী রহ.।

ঙ. ইদ্বায়াতুদ দুযনাহ (إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة): এটা আশয়ারী আকিদায় ইমাম শিহাবুদ্দীন মুকরী আত-তিলমিসানী রহ. (মৃ: ১০৪১ হি:) রচিত এক অনবদ্য পদ্য গ্রন্থ। এটার উপর প্রচুর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত শায়েখ মুহাম্মদ আলিশ রহ. (মৃ:১২৯৯ হি:) এর শরাহ।

চ. আকিদাতুস স্বলাহিয়্যাহ (العقيدة الصلاحية): সুলতান সালাহুদ্দিন আল-আইয়ূবী আশ-শাফেয়ী, আল-আশয়ারী রহ. এর দিকে নিসবত করে এ নামে নামকরণ করা হয়। যিনি ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজেতা এবং ক্রুসেডারদের থেকে তা মুক্তকারী। এ কিতাবের মূলনাম: "হাদায়িকুল ফুসুল ওয়া জাওয়াহেরুল উসূল (حدائق الفصول وجواهر الأصول)"। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ছোট ছোট শিশু এবং বড় বড় ছাত্রদেরকে এটা শিক্ষাদানের আদেশ জারি করেন। তিনি এটাকে মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র ও ইলমী মক্তবের পাঠ্যভূক্ত করে দেন। ফলে তারা এটা মুখস্থ এবং পুনরাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকতো। আর এতসব এজন্য যে, এ কিতাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তার গুণাবলির ইলম অন্তর্ভুক্তি ছিলো, ছিলো দ্বীনে ইসলাম, ইসলামী শরীয়ত ও উলামাদের তা'জীমের ব্যাপারে, শুধু তাই না সেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পন্থায় বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদার পরিচ্ছেদসমূহেরও অন্তর্ভুক্তি ছিলো।

প্রাথমিক স্তরের এসকল কিতাবের পরে মাধ্যমিক স্তরে একটু পর্যালোচনা মূলক কিতাব আসতে পারে। যেমন:

- ইমাম গাযালী রহ. "আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ (الاقتصاد في الاعتقاد)"।
- ইমাম রাযী রহ. "মায়ালিমু উসূলিদ্দীন (كتاب معالم أصول الدين)"।

- ইমাম সানুসী রহ. "আল-আকিদাতুল উসতা (العقيدة الوُسطى)"। আর এ প্রত্যেকটি কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ শরাহ বিদ্যমান।

আর চূড়ান্ত স্তরে সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ মিলিয়ে অনেক কিতাব বিদ্যমান। তবে তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো:

- বিখ্যাত ইমাম মুহাক্কিক আল্লামা সাদুদ্দীন তাফতাযানীর রহ. "শরহুল আকায়েদ (شرح العقائد النسفية)"; সাথে সাথে এটার শরাহ ও হাশিয়া।
- ইমাম তাফতাযানীর রহ. আরেকটি কিতাব "তাহযীবুল কালাম (تهذيب الكلام)"।
- ইমাম আদুদ্দিন ইযীর রহ. "কিতাবুল মাওয়াকেফ (كتاب المواقف)", সাথে সাথে এর উপর সাইয়্যেদ শরীফ যুরযানীর রহ. ব্যাখ্যাগ্রন্থ শরহুল মাওয়াকেফ (شرح المواقف)।
- ইমাম আমেদী রহ. "আবকারুল আফকার (أبكار الأفكار)" ইত্যাদি সহকারে আরো অন্যান্য গ্রন্থসমূহ, যেগুলো ইসলামী শরীয়ার নানা শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যতীত পড়তে পারা কঠিন। (১)

---

(১) পূর্বে আমরা আশয়ারী ধারায় আকিদার সিলেবাস উল্লেখ করেছি। এখন আমরা মাতুরিদী ধারায় আকিদার সিলেবাস উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রাথমিক স্তর:

১. প্রাথমিকভাবে একজন আকিদা শিক্ষার্থী শাইখুল ইসলাম, ইমামুদ দুনিয়া ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী (রহ.) রচিত, ***"আল-আকিদাতুত ত্বহাবিয়া"*** দিয়ে শুরু করবে। এর সাথে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রাখা যেতে পারে:

ক. আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-বাবেরতী (মৃ. ৭৮৬ হি.) রহ. রচিত শরহু আকিদাতুত ত্বহাবিয়াহ।

খ. আল্লামা আব্দুল গনী আল-গুনাইমী আল-মায়দানী (মৃ. ১২৯৮ হি.) রহ. রচিত শরহু আকিদাতুত ত্বহাবিয়াহ।

গ. আল্লামা হিবাতুল্লাহ তুরকিস্তানী (মৃ. ৭৩৩ হি.) রহ. রচিত শরহু আকিদাতুত ত্বহাবিয়াহ।

বি. দ্রঃ আকিদাতুত ত্বহাবীর আরো একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আছে, যেটা রচনা করেছেন শায়খ ইবনু আবিল ইয। এটার ব্যাপারে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আকিদা বিশারদ শায়খ আব্দুস সালাম শান্নার হাফি. মন্তব্য করেন (هُوَ مَلِيءٌ بِالتَّجْسِيمِ) অর্থাৎ কিতাবটি দেহত্ববাদীতে ভরপুর। অতএব প্রাথমিক পাঠকদের জন্য এটা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

২. এরপর সিরাজুদ্দিন উশি রহ. (মৃ. ৫৬৯ হি.), রচিত ***"মানজুমাতু বাদউল আমালী"***। আর এর সাথে আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) রচিত এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ***"দওউল মায়ালী"*** অনুসরণ করা যেতে পারে।

৩. এ স্তরে মোল্লা আলী কারী রহ. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সহকারে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. এর ***"আল-ফিকহুল আকবার"*** পড়া যেতে পারে।

মাধ্যমিক স্তরঃ

এ স্তরে একজন শিক্ষার্থী ইমাম আবু হাফস ওমর আন-নাসাফী রহ. (মৃ. ৫৩৭ হি.) রচিত **"মতনে আকায়েদে নাসাফিয়াহ"** পড়তে পারে। এক্ষেত্রে তার মানহায হবে নানা মতপ্রার্থক্যে না প্রবেশ করে মূল ইবারতের তাৎপর্য ও মর্ম হজম করা। এর সাথে পাঠক সাম্প্রতিক একাধিক গবেষকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ অবলম্বন করতে পারেন। যেমনঃ

ক. ড. আব্দুল মালিক সা'দী কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

খ. ড. হামযা ওয়াসিম আল-বাকরী কৃত "উসুসুল আকিদাহ"।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরঃ

এ স্তরে আল্লামা ইমাম সাদ উদ্দিন তাফতাযানী রহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) রচিত **"শরহুল আকায়েদ নাসাফিয়াহ"** পড়া হবে। এর সাথে সাথে এর গ্রহণযোগ্য হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ অবলম্বন করা হবে।

উচ্চস্তরঃ

এ স্তরে একাধিক চমৎকার এবং গভীর তত্ত্ববিশিষ্ট কিতাবাদি পড়া যেতে পারে। যেমনঃ

১. আল্লামা আদুদ্দিন ঈযী রহ. এর **"মাওয়াকেফ"** এবং আল্লামা শরীফ যুরযানী রচিত এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ **"শরহুল মাওয়াকেফ"**।

২. আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন দাওয়ানী রহ. রচিত **"শরহুল আকায়েদ আল-আদুদিয়াহ"**। পাশাপাশি এটার উপর আল্লামা আব্দুল হাকীম শিয়ালকোটি, আল্লামা গালানাবুরী এবং আল্লামা মারযানী রহ. সহ আরো অন্যান্য মুহাক্কিকদের হাশিয়া পড়া যেতে পারে। [অনুবাদক]

কলমের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এখানেই শেষ হলো। আমাদের কামনা- এই মূল্যবান কথাগুলো এ মনোমুগ্ধকর পৃষ্ঠায় চিরস্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ থাকুক। আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ লেখা ও আমাদের শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যাপক উপকার সাধন করেন। তিনি আমাদের ও প্রিয় পাঠকদের অতীত ও ভবিষ্যতের কল্যাণ দান করেন এবং হিদায়াতের সরল ও সুদৃঢ় পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আমিন।

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلهِ وصحْبه أجْمَعِنَ.

تَمَّتْ بِعَوْنِ الله تعالى.

উৎসগ্রন্থ ও তথ্যসূত্র

(১) সুবকী, তাজ উদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে আলি ইবনে আবদুল কাফি (মৃ: ৭৭১ হি.), *ত্বাবাকাতুশ শাফেঈয়াহ আল কুবরা,* (হাজর লিত্বায়াতি ওয়ান নশর ওয়াত তাওযি, ১৪১৩ হিজরী), দ্বিতীয় সংস্করণ, তাহকীক: মুহাম্মদ আত্- তনাহী ও আব্দুল ফাত্তাহ আল হালউই।

(২) ইবনু আসাকির (মৃ. ৫৭১ হি.), *তাবঈনু কাযিবিল মুফতারি,* (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৪ হি.) ৩য় সংস্করণ।

(৩) শরীফ যুরযানী, আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-যুরযানী (মৃ: ৮১৬ হি.), *শরহুল মাওয়াকেফ* (মিসর: মাতবায়াতুস সায়াদাহ, ১৩২৫ হি.)।

(৪) ত্বারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর (মৃ: ৩১০ হিঃ), *আত-তাবসীর ফি মায়ালিমিদ্দিন,* (দারুল আসেমাহ, ১৪১৬ হি.) ১ম সংস্করণ, তাহকীক: আলী আশ-শাবল।

(৫) ইবনু কুতাইবা, আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম দিনুরী (মৃ: ২৭৬ হিঃ), *তা'বিলু মুশকিলিল কুরআন,* (বৈরুত: দারুল কুতুব ইলমিয়াহ) ১ম সংস্করণ, তাহকীক: ইবরাহীম শামসুদ্দীন।

(৬) আবু আমর দানী, ওসমান ইবনে সাঈদ (মৃ: ৪৪৪ হিঃ), *আর রিসালাতুল ওয়াফিয়াহ লি মাযহাবি আহলিস সুন্নাহ,* (কুয়েত: দারুল ইমাম আহমদ, ১৪২১ হি.), ১ম সংস্করণ, তাহকীক: দাগশ আল-আজমী।

(৭) কায়সী, আবু মুহাম্মদ মক্কী ইবনে আবু তালিব কুরতুবী আল-মালেকী (মৃ: ৪৩৭ হিঃ), *আল হিদায়া ইলা বুলুগিল নিহায়া,* (জামেয়াতুস শারেকাহ: কুল্লিয়াতুস শরীয়্যাহ ওয়াদ দিরাসাতুল ইসলামীয়্যাহ, ১৪২৯ হি.), ১ম সংস্করণ।

(৮) বায়হাকী, আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল-খুরাসানী (মৃ: ৪৫৮ হিঃ), *শুয়াবুল ঈমান,* (মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৩ হি.) ১ম প্রকাশ।

(৯) ইমাম নববী, আবু যাকারিয়া মহী উদ্দীন ইবনে শরফ (মৃ: ৬৭৬ হিঃ), *আল-মিনহায শরহু সহীহিল মুসলিম,* (বৈরুত: দারু ইহইয়ায়ে তুরাসিল ইসলামী, ১৩৯২ হি.), ২য় সংস্করণ।

(১০) গাযালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তুসী, (মৃ: ৫০৫ হি:), *কাওয়ায়েদুল আকায়েদ,* (লেবানন, আলামুল কুতুব, ১৯৮৫ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, তাহকীক: মুসা আলী।

(১১) নাসির উদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আল-বাইদাবী (মৃ:৬৮৫ হি.), *তুহফাতুল আবরার শরহু মাসাবিহুস সুন্নাহ,* (কুয়েত:উযারাতুল আওকাফ ওয়া শুয়ুনিল ইসলামীয়া, ১৪৩৩ হি.)।

(১২) মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *সফওয়াতুত তাফাসীর,* (কায়রো: দারুস সাবুনী, ১৯৯৭ খ্রি.), ১ম সংস্করণ।

(১৩) ত্বারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর (মৃ: ৩১০ হিঃ), *জামেউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন,* (মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, ২০০০ সাল) ১ম সংস্করণ, তাহকীক: আহমদ শাকের।

(১৪) যামাখশারী, আবুল কাসেম যারুল্লাহ মাহমুদ ইবনে আমর (মৃ: ৫৩৮ হিঃ), *আল-ফায়েক ফি গারিবিল হাদীস,* (লেবানন: দারুল মারেফাহ) দ্বিতীয় সংস্করণ, তাহকীক: আলী আল-বাযায়ী ও মুহাম্মদ আবুল ফদ্বল ইবরাহীম।

(১৫) ইবনু ফুরাক, আবু বকর মুহাম্মদ বিন হাসান বিন ফুরাক আল-আনসারী আল-ইস্পাহানী, (মৃঃ ৪০৬ হিঃ), *মুশকিলুল হাদীস ওয়া বায়ানুহু,* (বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ১৯৮৫ সাল), দ্বিতীয় সংস্করণ, তাহকীকঃ মুসা আলী।

(১৬) খত্তাবী, আবু সুলাইমান হামদ বিন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে খাত্তাব আল-বুসতী (মৃঃ ৩৮৮ হিঃ), *মায়ালিমুস সুনান,* (হলবঃ মাতবায়াতুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৩২ সাল) প্রথম সংস্করণ।

(১৭) তাফতাযানী, সাদ উদ্দীন মাসউদ ইবনে ওমর (মৃঃ ৭৯৩ হিঃ), *শরহুল আকায়েদ আন-নাসাফিয়াহ মায়া হাশিয়াতুল খিয়ালী ওয়াল ইসাম,* (মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস, ২০০৪ সাল)।

(১৮) তাফতাযানী, সাদ উদ্দীন মাসউদ ইবনে ওমর, (মৃঃ ৭৯৩ হিঃ), *"শরহুল আকায়েদ আন-নাসাফিয়াহ"* (কায়রোঃ মাকতাবাতু কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যাহ, ১৯৮৭ সাল) ১ম সংস্করণ, তাহকীকঃ আহমদ সাকা।

(১৯) আল-আমির, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ (মৃঃ ১২৩১ হিঃ), *হাশিয়াতুল আমির আলা ইতহাফিল মুরিদ শরহে জাওহারতিত তাওহীদ,* (দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৪২২ হিজরী মোতাবেক ২০০১ সাল), প্রথম সংস্করণ।

(২০) আল-বাকিল্লানী, কাযী আবু বকর ইবনু তায়্যিব (মৃঃ ৪০৩ হিঃ), *আল-ইনসাফ ফিমা ইয়াযিব ওয়া লা ইয়াজুয্যু আল-জাহলু বিহি* (মিসরঃ মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত তুরাস) তাহকীকঃ ইমাম জাহীদ আল-কাওসারী।

(২১) তাফতাযানী, সাদ উদ্দীন মাসউদ ইবনে ওমর, (মৃঃ ৭৯৩ হিঃ), *শরহুল মাকাসেদ ফি ইলমিল কালাম,* (পাকিস্তানঃ দারুল মায়ারিফ আন-নুমানিয়্যাহ, ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১)।

(২২) আর-রাফেঈ, আবুল কাসেম আব্দুল করীম ইবনু মুহাম্মদ আল-কাযবিনী (মৃ. ৬২৩ হি.), *আল-আযীয শরহুল ওয়াযীয,* (বৈরুতঃ দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, ১৪১৭হি.), ১ম সংস্করণ, তাহকীকঃ আলী এওয়াদ ও আদেল আব্দুল মাওযুদ।

(২৩) ইবনু নাকীব, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে লুআ'লুই (মৃঃ ৭৬৯ হিঃ), *উমদাতুস সালেক ওয়া উদ্দাতুন নাসেক,* (কাতারঃ শুয়ুনি দ্বিনিয়াহ, ১৯৮২ সাল), প্রথম সংস্করণ।

(২৪) আল-হিযাভী, মুসা ইবনে আহমদ সালেহী, (মৃঃ৯৬৮ হিঃ), *আল-ইকনা ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল,* (বৈরুত, লেবাননঃ দারুল মারেফাহ), তাহকীকঃ আব্দুল লতিফ সুবকী।

(২৫) আল-করমী, মারঈ ইবনে ইউসুফ হাম্বলী, (মৃঃ ১০৩৩ হিঃ), *দলীলুত ত্বলেব লি নাইলিল মাতালেব* (রিয়াদঃ দারু তাইবা লিন-নশরে ওয়াত তাওযীহ, ১৪২৫ হিজরী মোতাবেক ২০০৪ সাল) প্রথম সংস্করণ, তাহকীকঃ আবু কুতায়বা আল-ফারইয়াবী।

(২৬) নববী, আবু যাকারিয়া মহী উদ্দীন ইবনে শরফ (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ), *রওদাতুত ত্বলেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন,* (বৈরুতঃ মাকতাবুল ইসলাম, ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ১৯৯১ সাল), তৃতীয় সংস্করণ, তাহকীকঃ জুহাইর শাউইশ।

(২৭) আল-আনসারী, আবু ইয়াহইয়া জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ (মৃঃ৯২৬ হিঃ), *আসনাল মাতালিব ফি শরহে রওদিত ত্বলেব,* (দারুল কিতাবিল ইসলামী)।

(২৮) ইবনে আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন (মৃঃ ১২৫২ হিঃ), *রদ্দুল মুহতার আ'লা দুররিল মুখতার* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১২হি.=১৯৯২ খ্রি), তৃতীয় সংস্করণ।

(২৯) খরশী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মালেকী, (মৃঃ১১০১ হিঃ), *শরহু মুখতাসারিল খলিল,* (বৈরুতঃ দারুল ফিকির লিতত্বাবায়াহ)।

(৩০) আল-বুহুতী, মানসুর ইবনে ইউনুস আল-হানবলী (মৃঃ ১০৫১ হিঃ), *দাকায়েকু উলিন নুহা লি শরহিল মুনতাহা* (আলামুল কুতুব, ১৪১৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৩ সাল), প্রথম সংস্করণ।

আকিদা-মানবজীবনের আলোকবর্তিকা, চিন্তা ও কর্মের দিকনির্দেশক এবং আখিরাতে মুক্তির মূল পাথেয়। এটি কেবল বিশ্বাস নয়, বরং অন্তরের বিশুদ্ধতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও আত্মার নিরাপত্তার ভিত্তি। আল্লাহ প্রদত্ত বিবেচনাশক্তি যখন বিশুদ্ধ ঈমান ও ইসলামী নৈতিকতার আলোকে পরিচালিত হয়, তখনই তা মানুষকে সফলতায় পৌঁছে দেয়। ইতিহাস প্রমাণ করে, বিশুদ্ধ আকিদাই জাতিকে দিয়েছে মর্যাদা, আর বিকৃত আকিদা তাদের করেছে বিভ্রান্ত ও দুর্বল।

প্রকাশক

ইত্তকান একাডেমি

দারুননাজাত, পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৩০৫৩৩০৭১৭

পরিবেশক

مكتبة النهضة

মাকতাবাতুন নাহদাহ

দারুননাজাত, পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৩০৫৩৩০৭১৭